Vol. 42 | No. 1 | 1998

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

নজরুলের নাম-কবিতার পটভূমি ও অন্যান্য তথ্য

Volume	42
Issue	1
Year	1998
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আবু হেনা আবদুল আউয়াল
Published online	October 1, 1998
DOI	10.62328/sp.v42i1.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v42i1.5
Pages	153-217
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

নজরুলের নাম-কবিতার পটভূমি ও অন্যান্য তথ্য

আবু হেনা আবদুল আউয়াল*

ভূমিকা

ব্যক্তি বিশেষের নাম কবিতার শিরোনামে উল্লেখ করে এবং একই সংগে শিরোনামোক্ত ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে লিখিত কবিতাই নাম-কবিতা। জীবিত বা মৃত যে কোনো ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে এ জাতীয় কবিতা রচিত হতে পারে। কবি যাঁর প্রতি প্রীত, প্রসন্ন ও শ্রদ্ধাশীল এবং যাঁর আদর্শ ও গুণরাজী তাঁকে আকৃষ্ট করে এমন ব্যক্তিই নাম-কবিতার বিষয়বস্তু হয়ে থাকেন। হৃদয়ের উষ্ণ প্রীতিতে ও পরম শ্রদ্ধায় কবি স্মরণ করেন ঐ ব্যক্তির স্মৃতি, কীর্তি, ভূমিকা ও অবদান। কবি নির্বাচিত ব্যক্তিকে কল্পনায় তাঁর চোখের সামনে এনে নাম-কবিতা রচনা করেন। সাধারণত বিশেষ কোনো উপলক্ষে (যেমন, জন্মবার্ষিকী, মৃত্যুবার্ষিকী, বিশেষ ঘটনা, যুদ্ধ জয় প্রভৃতি) এ জাতীয় কবিতা রচিত হয়। তাই স্বভাবতই এতে থাকে আবেগের আধিক্য এবং সে সূত্রেই থাকে ভক্তি ও উক্তির অকৃপণ অপরিমিতি।

বিশ্বের অন্যান্য ভাষার মতো বাংলা ভাষায়ও নাম-কবিতার ঐতিহ্য রয়েছে। কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) সেই ঐতিহ্যানুসারী হয়েও ভিন্ন স্বাদ ও সৌন্দর্যের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। বিপ্লবী রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা, মানসিক ঔদার্য ও প্রাতিস্বিক জীবনাভিজ্ঞানে তাঁর নাম-কবিতাগুলো বিশেষ মর্যাদায় সংসিক্ত। ব্যক্তি বিশেষকে উদ্দেশ্য করে রচিত হলেও এসব কবিতায় তিনি উপনবিশে-শৃঙ্খলিত স্বদেশের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই নানাভাবে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। ফলে এসব কবিতার একটা ভিন্ন উপযোগিতা সৃষ্টি হয়েছে। শুধু নাম কবিতাই নয় - তিনি 'চিত্তনামা' (১৯২৫) নামে একটি নাম-কবিতা গ্রন্থও রচনা করেছেন। আধুনিক কাব্য সাহিত্যে এ জাতীয় কাব্যগ্রন্থ একেবারে অভিনব।

---

* বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা

কবি জীবনের প্রায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সময়-পরিসরে বিভিন্ন উপলক্ষে তিনি তাঁর নাম-কবিতাগুলো রচনা করেছেন। তাঁর বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ও গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত নাম-কবিতাগুলোর তালিকা নিম্নরূপ,

কামাল পাশা	(অগ্নিবীণা, ১৯২২)
আনোয়ার	(ঐ)
গোকুল নাগ	(সর্বহারা ১৯২৬)
অশ্বিনীকুমার	(ফনি-মনসা, ১৯২৭)
ইন্দু-প্রয়াণ	(ঐ)
সত্যেন্দ্র-প্রয়াণ	(ঐ)
সত্য-কবি	(ঐ)
মিসেস এম. রহমান	(চিরঞ্জীব, ১৯২৮)
খালেদ	(ঐ)
চিরঞ্জীব জগলুল	(ঐ)
আমানুল্লাহ	(ঐ)
উমর ফারুক	(ঐ)
বাংলার 'আজিজ'	(সন্ধ্যা, ১৯২৯)
শরৎচন্দ্র	(ঐ)
মনীন্দ্র-প্রয়াণ	(প্রলয়-শিখা, ১৯৩০)
যতীন দাশ	(ঐ)
কিশোর রবি	(নতুন চাঁদ, ১৯৪৫)
রবির জন্মতিথি	(শেষ সওগাত, ১৯৫৯)
মহাত্মা মোহসিন	(গ্রন্থাকার অপ্রকাশিত)
সালাম আস্ত 'রবি'	(ঐ)

মাওলানা মোহাম্মদ আলী	(ঐ)
রবি-হারা	(ঐ)
নবীনচন্দ্র	(ঐ)

এসব কবিতায় নির্বাচিত ব্যক্তিগণ নানাভাবে পরস্পর থেকে ভিন্ন - কেউ তাঁর সমকালীন, কেউ দূরকালীন, কে স্বদেশি, কেউ বিদেশি, কেউ পুরুষ, কেউ নারী, কে রাজনীতিক, কেউ সাহিত্যিক, কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান, কেউ জীবিত আবার কেউ মৃত। অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এতো ভিন্নতার মাঝেও তাঁদের মধ্যে একটা ঐক্যসূত্র আছে—আর তা হলো - তাঁরা সবাই প্রগতিশীল, জাগরণবাদী এবং প্রচলিত সংস্কার-বিরোধী। তাঁদের মধ্যে অনেকে বিপ্লবী এবং স্বদেশের স্বাধীনতার উপাসক। এসব নাম কবিতার পাশাপাশি তিনি তাঁদের মধ্যে থেকে মুহম্মদ মোহসিন (১৭৩২-১৮২২), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে (১৮৮২-১৯২২) নিয়ে এবং জালালউদ্দীন আফগানী (১৮৩৯-৯৭) আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (১৮৬৪-১৯২৪), যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত (১৮৮৫-১৯৩৩), হেমপ্রভা মুজমদার (১৮৮৮-১৯৬২)) ও পূর্ণচন্দ্র দাস (১৮৮৯-১৯৫৬) প্রমুখ বিপ্লবী নেতাকে নিয়ে নাম-গান রচনা করেছেন। সেগুলোও নাম-কবিতার ভাবানুষঙ্গী এবং একই উদ্দেশ্যকেন্দ্রিক। এছাড়া, অন্য শিরোনামেও তিনি আরো কিছু ব্যক্তির গুণকীর্তন করে কবিতা লিখেছেন। এখানে আমরা শুধু তাঁর নাম-কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করবো। কবিতার পটভূমি উন্মোচন ও বিষয় বিশ্লেষণ আমাদের অন্বীক্ষা। আলোচনার সুবিধার জন্যে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক নাম কবিতা ছাড়া অন্য সব নাম কবিতা নজরুলের রচনাবলীতে অন্তর্ভুক্তির ধারাক্রম অনুসরণ করেছি।

কামাল পাশা

ওসমানীয় সুলতানের অধীন একজন সামরিক অফিসার হিসেবে কামাল পাশা (১৮৮১-১৯৩৮) কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯১১ সালে লিবিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধে প্রথম বারের মতো তিনি অধিনায়ক রূপে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ১৯১৬ সালে রাশিয়ার যুদ্ধে সাফল্যের জন্যে জেনারেল পদে উন্নীত হন। এরপর গ্যালিপলি যুদ্ধেও তিনি ইংরেজদের আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হন। পাশ্চাত্যের মদদে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন পয়েন্টে ও সীমান্তে যুদ্ধ চলছিল। এ অবস্থা কামালের মনে

রেখাপাত করে। তিনি সাহসিকতার সংগে সীমান্ত সংঘর্ষগুলোর ফলাফল নিজের অনুকূলে আনার চেষ্টা করেন এবং অনেক ক্ষেত্রে সফলও হন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৯) তুরস্ক অক্ষশক্তিভুক্ত হয়ে জার্মানিকে সহায়তা করে। এর প্রতিশোধ গ্রহণার্থে যুদ্ধে বিজয়ী মিত্রশক্তি 'সেভর চুক্তি' স্বাক্ষর করে (১০ আগস্ট, ১৯২০)। এ চুক্তিতে দেশের পূর্বাঞ্চলে কুর্দি ও আর্মেনীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং দক্ষিণাঞ্চল ইটালি ও ফ্রান্সের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেবার কথা বলা হয়। এ চুক্তির পূর্বে গ্রিকরা ইজমির আক্রমণ করে (১৯ মে ১৯১৯) এবং তুরস্কের ইউরোপীয় অংশ গ্রাস করে নেয়। কামাল পাশার নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদীরা 'সেভর চুক্তি' প্রত্যাখ্যান করে। ১৯১৯ সালে (ডিসেম্বর) অনুষ্ঠিত পার্লামেন্টের নির্বাচনে কামালপন্থী জাতীয়তাবাদীরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন। এরপর তাঁরা সালতানাত সরকার বিলুপ্ত ঘোষণা করেন, কামাল পাশাকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেন এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করেন (Bernard Lewis, 1968 : 250)।

ক্ষমতা গ্রহণের পর কামাল পাশা তুরস্ক–ভূখণ্ড থেকে ব্রিটিশ ও ব্রিটিশ–সমর্থন পুষ্ট গ্রিকদের বিতাড়ন শুরু করেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর দুই প্রধান সহচর - ইসমত পাশা ও ফেরজী পাশা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। (এস, এম. হাসান, ১৯৮৯ : ১৩৩-৩৪)। ১৯২০, ১৯২১ ও ১৯২২ সালে গ্রিকদের বিরুদ্ধে পর পর ক'টি অভিযানে তিনি নেতৃত্ব দেন। ১৯২১ সালের জুলাই মাসে গ্রিকরা নতুন করে আক্রমণ শুরু করে। এমতাবস্থায় তিনি স্বয়ং যুদ্ধ ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়ে প্রত্যাক্রমণ করেন এবং বীরত্বপূর্ব যুদ্ধে তাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন (২৪শে আগস্ট)। এ যুদ্ধই ইতিহাসে 'সাকারিয়া যুদ্ধ' নামে খ্যাত। এ যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করায় গ্র্যাণ্ড এসেম্বলি (জাতীয় সংসদ) কামাল পাশাকে 'গাজী' উপাধিতে ভূষিত করে (Beronard Lewis, 253)। সাকারিয়া যুদ্ধ জয়ের পটভূমিতেই 'কামাল পাশা' কবিতাটি রচিত হয় বলে মনে করা হয় (রফিকুল ইসলাম, ১৯৯১ ঃ ৬৯)। এজন্যেই এ কবিতায় কামাল পাশাকে বিজয়ী বীর রূপে দেখা যায়। অথচ কামাল পাশা গ্রিকদের বিরুদ্ধে শেষ অভিযান পরিচালনা করেন ১৯২২ সালের ১৮ আগস্ট এবং পূর্ণ রূপে জয়লাভ করেন ৯ সেপ্টেম্বর। সুতরাং সাকারিয়া যুদ্ধে বিজয়ী কামালকে নিয়ে নজরুল 'কামাল পাশা' কবিতাটি রচনা করেন (অক্টোবর, ১৯২১)–এ মতই সত্য। কবিতাটি ১৯২১ সালে 'মুসলিম ভারত' (১৯২১) পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয় (রফিকুল ইসলাম, ১৯৬১ ঃ ১৪)।

যুদ্ধে গ্রিক সৈন্যদের পরাজিত করে বিজয়োন্মত্ত তুর্কি সৈন্যরা কামালকে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র হতে তাঁবুর দিকে ফিরছেন – এ ভাবচিত্র কবিতাটিতে বিধৃত। এর নির্মাণ-কৌশলও অভিনব। কবিতাটির পটভূমি উন্মোচিত হয়েছে গদ্য-ভূমিকায়। সৈন্যদের জবানিতে কামালের বীরত্ব কীর্তিত হয়েছে। বিজয়োন্মত্ত সৈন্যরা মার্চের তালে তালে কামালের সাহসিকতা ও বীরত্বগাথা গেয়ে বলেছে :

ঐ ক্ষেপেছে পাগলী মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই,
অসুর পুরে সোর উঠেছে জোরসে সামাল সামাল তাই।
কামাল তুনে কামাল কিয়া ভাই।
হো হো কামাল তুনে কামাল কিয়া ভাই।

অথবা,

সাব্বাস ভাই। সাব্বাস দিই, সাব্বাস তোর শমশেরে,
পাঠিয়ে দিলি দুশমনে সব যম ঘর একদম সেরে।
বল দেখি ভাই, বল হাঁরে,
দুনিয়ায় কে ডর করে না তুর্কির তেজ তলোয়ারে।

এ কামাল পাশা পরবর্তীকালে খিলাফততন্ত্র উচ্ছেদ করেন (১ নভেম্বর, ১৯২২) এবং দেশকে 'প্রজাতন্ত্র' ঘোষণা করেন (২৯ অক্টোবর ১৯২৩)। তাঁর শাসনামলে (১৯২০-৩৮) তিনি তুরস্ককে আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করেন।

'কামাল পাশা' কবিতাটি রচনার পরও কামালের আধুনিক সংস্কার কর্মসূচি ও তাঁর প্রতি নজরুলের সমান উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। তাঁর সম্পাদিত 'ধূমকেতু'তে (১৯২২) কামালের খবরাখবর গুরুত্বসহ প্রকাশ করা হতো। তাঁর বিভিন্ন লেখা ও বক্তৃতায়ও কামালের আদর্শ অনুসরণের আহ্বান লক্ষ্যযোগ্য। এমন কি, তিনি তাঁর প্রথম ছেলে কৃষ্ণ মোহাম্মদের (জ. ১৯২৫) অন্য নাম রাখেন 'আজাদ কামাল'।

আনোয়ার

১৯১৮ সালে (অক্টোবর) মিত্রপক্ষের সংগে তুরস্কের সন্ধি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে আনোয়ার পাশা (১৮৪৯-১৯২২), কামাল পাশা, জামাল পাশা ও তালাত পাশা প্রমুখ

দেশত্যাগ করেন। পরে কামাল পাশা, জামালা পাশা ও তালাত পাশা দেশে ফিরে আসেন, কিন্তু আনোয়ার ফিরে আসেননি। তিনি বিদেশের ঘাঁটিতে থেকে দেশের স্বাধীনতার জন্যে আন্দোলন সংঘটনের চেষ্টা করেন। তিনি প্রথমে জার্মানির সাহায্য চান, তাতে ব্যর্থ হয়ে রাশিয়া চলে যান। সেখানে তিনি তুর্কি প্রতি–বিপ্লবীদের সংগে যোগ দেন। তিনি ভারতের ও মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানদের ব্রিটিশ–বিরোধী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেন। আমীর আমানুল্লাহর (১৮৯২–১৯৬১) সাহায্য লাভের আশায় তিনি আফগানিস্তানে সদর দপ্তর স্থাপন করেন। আনোয়ার পাশার এ ইংরেজ-বিরোধী ভূমিকা নজরুলকে আকৃষ্ট করেছে (রফিকুল ইসলাম, ১৯৯১, ঃ ২৮০)। তিনি নব্য তুর্কি আন্দোলনের বীরযোদ্ধা হিসেবেই তাঁকে বিবেচনা করেছেন এবং সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই 'আনোয়ার' কবিতাটি রচিত হয়েছে (১৯২১)। কবিতাটি ১৯২১ সালে 'সাধনা' (১৯১৮) পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ সপ্তম সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয় (রফিকুল ইসলাম, ১৯৬৯ ঃ ১৪)।

কবিতাটিতে আনোয়ারের বীরত্ব ও তৎকালীন মুসলিম জগতের অধঃপতনের চিত্র ফুটে উঠেছে। কবিতাটি এক সৈন্যের মুখে উচ্চারিত। তিনি আনোয়ারকে আহ্বান করেছেন জোর তলোয়ার হেনে শত্রুদের পর্যুদস্ত করে দিতে,

আনোয়ার। আনোয়ার।
দিলওয়ার তুমি, জোর তলওয়ার হানো, আর
নেস্ত ও নামুদ কর, মারো যত জানোয়ার।

তৎকালীন বিশ্বে মুসলমানদের পশ্চাৎদৃষ্টি, ভীরুতা ও বিশ্বাসঘাতকতা নজরুলকে বিক্ষুব্ধ করেছে। তাই এ কবিতায় ঐ মুসলমানরা 'জানোয়ার' তুল্য। অন্তত সাতবার তিনি তাদের সরাসরি জানোয়ার বিশেষণে বিশেষিত করেছেন। সৈনিকের জবানিতে আনোয়ারের প্রতি তাঁর নির্দেশ ও আহ্বান ঃ

আনোয়ার, আনোয়ার !
পাশা তুমি নাশা হও মুসলিম জানোয়ার,
ঘরে যতো দুশমন, 'পরে কেন হানো মার ?
আনোয়ার। এস ভাই
আজ সব শেষ–ও যাই।

গভীরার্থে এ কবিতায় আনোয়ার উপলক্ষ মাত্র। তাঁকে উদ্দেশ্য করে কবি তাঁর স্বদেশের মুসলমানদের প্রতিই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। আনোয়ার পাশাকে নিয়ে নজরুল যখন এ কবিতা রচনা করেন তখন পর্যন্ত তাঁর প্রতি-বিপ্লবী কার্যকলাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেনি। কবিতাটি রচিত হয় ১৯২১ সালে আর প্রতি-বিপ্লবী তুর্কিদের দলে যোগ দেয়ার পরিণামে রুশ লাল ফৌজের সংগে সংঘর্ষে তিনি মারা যান ১৯২২ সালে। অতএব, আনোয়ার পাশার বিপ্লবী চরিত্রই এ কবিতার প্রেরণা সূত্র।

তাঁর মৃত্যুর পর 'ধূমকেতু'র ত্রয়োদশ সংখ্যায় 'মৃত্যুঞ্জয় আনোয়ার' শিরোনামে খবর প্রকাশ করা হয় (১৯২২ ঃ ৭)। এ ছাড়া সমগ্র নজরুল সাহিত্যের আর কোথাও আনোয়ারের উল্লেখ নেই।

গোকুল নাগ

গোকুল চন্দ্র নাগ (১৮৯৪-১৯২৫) এক সপ্রতিভ জীবন-শিল্পী। অল্প বয়সেই তিনি চিত্রাঙ্কন ও সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। তাঁর কিছু গল্প প্রবাসী, ভারতী, নব্যভারতী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর নির্বাচিত নয়টি গল্প নিয়ে বের হয় 'রূপরেখা' (১৯২২) নামে গল্প সংকলনে। তাঁর 'পথিক' (১৯২৫) উপন্যাসটি 'কল্লোলে'র (১৯২৩) প্রথম বর্ষ থেকেই প্রকাশ হতে থাকে (গোপিকা নাথ রায় চৌধুরী, ১৯৮৬ : ২৩৩-৩৫)। 'কল্লোল' প্রকাশের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত 'ফোর আর্টস ক্লাব'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তিনি।

ছবির জগতেও তিনি প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে শুরু করছিলেন। তিনি 'সোল অব স্লেভ' ছবির প্রযোজনা সহকারী হিসেবে কাজ করেন এবং এতে অভিনয়ও করেন (অঞ্জলি বসু, ১৯৭৬ : ১৩০)। তিনি ছিলেন একাধারে সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্র ও অভিনয় শিল্পী। তবে তাঁর এসব পরিচয় তাঁর সম্পাদক পরিচয়ের আড়ালে অনেকটাই ঢাকা পড়ে গেছে। শ্রীদীনেশ রঞ্জন দাশের (১৮৮৮-১৯৪১) সম্পাদনায় প্রকাশিত 'কল্লোল' (১৯২৩) পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন তিনি। এ দু'জনের সংগে নজরুলের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা ছিলো। শুধু তাই নয়, কল্লোলকে কেন্দ্র করে যে 'কল্লোল গোষ্ঠী' গড়ে ওঠে, তাঁদের সংগেও তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়।

কল্লোলের দ্বিতীয় সংখ্যা থেকেই নজরুল তাতে লিখতে শুরু করেন। এ সংখ্যায় তাঁর বিখ্যাত গীতিকবিতা 'আজ সৃষ্টির সুখের উল্লাসে' প্রকাশিত হয় (রফিকুল

ইসলাম, ১৯৬৯ ঃ ২৫)। এরপর থেকে গোকুলের মৃত্যু পর্যন্ত কল্লোলে নজরুলের আটটি কবিতা ও গান প্রকাশিত হয় (ঐ, ২৫–৩৩)। এসব কবিতা বা গানের নাতিদীর্ঘ পরিচয়, নজরুলের ওপর মন্তব্য ও সংবাদাদি ছাপা হতো।

কল্লোলের ১৩৩১ সনের বৈশাখ সংখ্যার 'সমাচার' স্তম্ভে লেখা হয়, "আমাদের বন্ধু ও বাংলার বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাহায্যকল্পে গত বুধবার ৯ এপ্রিল আলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে প্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ভাদুড়ী মহাশয়ের চেষ্টায় বিশিষ্ট ভদ্র মহোদয়গণ আবৃত্তি, সংগীত ও বসন্তলীলা অভিনয় করিয়া কলিকাতাবাসীর আনন্দ বর্ধন করিয়াছেন। আমরা কবি ও তাঁহার সাহায্যকারী সকলকে প্রীতি সম্ভাষণ জানাইতেছি।" (মোবাশ্বের আলী, ১৯৯৫ : ১২৬)। এ থেকে কল্লোলের সংগে নজরুলের সম্পর্কের গভীরতা সহজেই আঁচ করা যায়। আলোচ্য সময়ে 'ব্যথার দান' (১৯২২) ও 'বিষের বাঁশী' (১৯২৪) প্রকাশিত হলে কল্লোলে তাঁর প্রশংসাসূচক আলোচনা ছাপা হয় (ঐ, ১২৪–২৬)। হুগলির হামিদুন নবী মোক্তারের বাড়িতে থাকাকালে নজরুলের প্রথম ছেলে কৃষ্ণ মোহাম্মদের জন্মের ২১ দিনের মাথায় অনুষ্ঠিত আকিকা অনুষ্ঠানে অন্যান্য সাহিত্যিকদের মধ্যে দিনেশ রঞ্জন দাশ ও গোকুল নাগও উপস্থিত ছিলেন (রফিকুল ইসলাম, ১৯৯১ : ১০৫)।

গোকুল নাগ দার্জিলিং–এ যক্ষারোগে মারা গেলে নজরুল শোকাহত চিত্তে রচনা করেন 'গোকুল নাগ' কবিতাটি। গোকুল নাগ মারা যান ৮ আশ্বিন, আর নজরুল কবিতাটি লেখেন ৩০ কার্তিক (হুগলিতে)। পরবর্তী মাসে (অগ্রহায়ণ) কল্লোলের তৃতীয় বর্ষ অষ্টম সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হয় (রফিকুল ইসলাম, ১৯৬৯ : ৩৫)।

গোকুলের মৃত্যু হয়েছিলো আশ্বিন মাসে, শরৎকালে ; আর নজরুল কবিতাটি লিখেছিলেন কার্তিক মাসে, হেমন্তকালে। শরৎ ও হেমন্ত প্রকৃতির বিভিন্ন উপমা-রূপকের মাধ্যমে কবি তাঁর মৃত্যু–চিত্রে তুলে ধরেছেন,

না ফুরাতে শরতের বিদায় শেফালী,
না নিবিতে আশ্বিনের কমল দীপালি
তুমি শুনেছিলে বন্ধু পাতা ঝরা গান
ফুলে ফুলে হেমন্তের বিদায় আহ্বান।

কবিতাটি লেখার সময় কবির মনে বন্ধু গোকুল নাগের স্মৃতি ভেসে উঠেছে। তাঁর উদ্দেশে তিনি শোকগীতি গাইছেন। গোকুলের ফেলে যাওয়া পথ ও পথচলার স্মৃতি–

সবই আছে। শুধু নেই নব নব ভালোবাসা, দেখার আনন্দ। তাঁর প্রয়াণে তাই কবির হৃদয়ে অসীম শূন্যতা ও হাহাকার সৃষ্টি হয়েছে। কবি এ বলে সান্ত্বনা খোঁজেন যে, তিনি হয়তো আবার নতুন পরিচয়ে ধরা দেবেন, ধন্য হবে আমাদের সাহিত্য-জগৎ। কিন্তু এ আত্মকল্পিত সান্ত্বনার মধ্যেও শূন্যতা ও শোক দূর হয় না,

তবু যেন হায়
হৃদয়ের কোথা কোন ব্যথা থেকে যায়।
কোথায় যেন শূন্যতার নিঃশব্দ ক্রন্দন,
গুমরি' গুমরি' ফেরে, হু হু করে মন।

তিনি সকলের বা সবাই তাঁর কিংবা তাঁর অবদান সকলের। কিন্তু কবি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর বন্ধু, সখা, প্রিয়, ভাই পরম স্বজনকে হারিয়েছিলেন। তাই তিনি এ অসীম শোকে কোথাও সান্ত্বনা পাচ্ছেন না,

বাণী তব – তব দান – সে ত সকলের
ব্যথা সেথা নয় বন্ধু। যে ক্ষতি একের
সেথায় সান্ত্বনা কোথা? সেথা শান্তি নাই,
মোরা হারিয়েছি, – বন্ধু, সখা, প্রিয়, ভাই।

গোকুলের স্মৃতি কবিকে পীড়িত করে। তিনি অশ্রু সংবরণ করতে পারছেন না। আত্মীয় স্বরূপ ও ব্যক্তির মৃত্যুর শোকে তিনি অশ্রুসজল,

আত্মীয় স্মরিয়া কাঁদি, কাঁদি প্রিয় তরে,
গোকুল পড়েছে মনে – তাই অশ্রু ঝরে।

ব্যথার সাগরে ভাসিয়ে অকালে চলে-যাওয়া বন্ধুর প্রতি কবির মিনতি এই,

হে পথিক বন্ধু মোর, হে প্রিয় আমার
যেখানে যে লোকে থাক করিও স্বীকার
অশ্রু-রেবা কূলে মোর এ স্মৃতি তর্পণ
আমারে অঞ্জলি করি, করিনু অর্পণ।

তাঁর এ স্মরণ যে আড়ম্বরহীন সে সম্পর্কেও তিনি সজাগ ছিলেন। কবিতাটি

প্রকাশের পর কল্লোলের ১৩৩২ সনের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় মন্তব্য করা হয়, "এবারে কাজী নজরুল ইসলাম 'গোকুল নাগ' বলে যে কবিতা লিখেছেন তার শেষের দিকটা আজকালকার বাংলা সাহিত্যের নিষ্ঠাবান সাহসী সেবকদের যেন সত্যিকারের ছবি।" (মুস্তাফা নূর-উল ইসলাম, ১৯৮৩ : ৬৪)।

কবির বিশ্বাস, আগামী দিনের ইতিহাসে গোকুল নাগ তাঁর অবদানের জন্যে সম্মানজনক আসনে অধিষ্ঠিত হবেন। অর্থবলে ও বাহুবলে যারা আজ সম্মানের শিরোপা দখল করেছে তারা বেশিদিন টিকে থাকবে না। কারণ, মহৎ কর্ম ও সৃজনশীলতাই পৃথিবীতে টিকে থাকে।

অশ্বিনীকুমার

অশ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৫৬–১৯২৩) ছিলেন তৎকালীন ব্রিটিশ শাসিত বাংলার বিশেষত বরিশালের রাজনীতি শিক্ষা ও সংস্কৃতির পুরোধা। ওকালতি পাশের পর একটি মাত্র মামলা পরিচালনা [বরিশালের জমিদার মুহম্মদ ইসমাইল চৌধুরীর পক্ষে] ও তাতে জয়লাভ করে তিনি আইন পেশা ত্যাগ করেন ও প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগদান করেন। ১৮৮৪ সালে তিনি নিজস্ব ভূমিতে তাঁর পিতার নামানুসারে 'ব্রজমোহন স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী সময়ে (১৮৮৯) এটি কলেজে পরিণত হয়। তিনি কিছুদিন তার অধ্যক্ষও ছিলেন। তিনি ছিলেন উদার ও অসাম্প্রদায়িক। মানবসেবাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। বহু হিন্দু, মুসলমান ও তপসিলি সম্প্রদায়ের অসহায় লোককে তিনি নানাভাবে সাহায্য করেন। জমিদার-নন্দন হয়েও তিনি নিজেকে সর্ব সাধারণে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি নিজেকে 'ইব্রাহিম'-ধর্মের লোক বলে পরিচয় দিতেন। তিনি 'ই' দ্বারা ইসায়ী, 'ব্রা' দ্বারা ব্রাহ্ম, 'হি' দ্বারা হিন্দু, 'ম' দ্বারা মহম্মদ বুঝাতেন (আবদুর রহমান, ১৯৬৪ : ৩৩)। মানুষে মানুষে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্যে তিনি 'মানব সমাজ,' 'বান্ধব সমিতি', 'অশ্বিনী সম্প্রদায়' গড়ে তোলেন। তিনি বরিশালে নারীশিক্ষার জন্যে 'বাখরগঞ্জ হিতৈষিণী সভা', ও 'গার্লস স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। অশ্বিনীকুমার বরিশাল মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার, ভাইস চেয়ারম্যান ও চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন (অঞ্জলি বসু, ১৯৭৬ : ৩০)।

১৯০১ সালে বরিশালে জাতীয় কংগ্রেসের (১৮৮৫) শাখা গঠিত হলে তিনি একাধিকবার এর সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি স্বদেশী আন্দোলনে (১৯০৫–১১) সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। এ সময় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের (১৯০৬) অধিবেশনে

পুলিশের লাঠিচার্জে তিনি আহত হন। আলীপুর বোমা মামলার (১৯০৮) অন্যতম আসামিও ছিলেন তিনি (রফিকুল ইসলাম, ১৯৯১ : ৩৫৬)। ১৯০৮ হতে ১৯১০ সাল পর্যন্ত তিনি জেলেবন্দী ছিলেন। ১৯১৩ সালে তিনি ঢাকায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। পরবর্তীকালেও তিনি কংগ্রেসের নেতা ও কর্মীরূপে রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের মতো অসহযোগ আন্দোলনেও তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। এ সময় মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮) প্রথমবারের মতো বরিশালে আসেন ও অশ্বিনীকুমারকে সম্মান জানান (অঞ্জলি বসু, ৩১)।

অশ্বিনীকুমার রাজনীতি ও জনসেবার পাশাপাশি কতকগুলো গ্রন্থও রচনা করেন : 'ভক্তিযোগ', 'কর্মযোগ', 'প্রেম', 'দুর্গোসবতত্ত্ব', 'আত্মপ্রতিষ্ঠা', 'ভারতগীতি'। 'ধূমকেতুর কয়েকটি সংখ্যায় 'কর্মযোগ' ও 'প্রেম' গ্রন্থ দুটোর বিজ্ঞাপন ছাপা হয়। ঐ বিজ্ঞাপনে অশ্বিনীকে 'বরিশালের সুপ্রসিদ্ধ জননায়ক' বলে আখ্যাত করা হয়।

ধূমকেতুর ঊনবিংশ সংখ্যায় 'অশ্বিনীকুমার পীড়িত' নামে দুটি সংক্ষিপ্ত সংবাদ ছাপা হয় (১৯২২ : ৭,৮) আবার বিংশ সংখ্যায় 'অশ্বিনী বাবুর স্বাস্থ্য' শিরোনামের সংবাদে লেখা হয়, "অশ্বিনী বাবু এখনও আরোগ্য হতে পারেন নাই। জ্বরের পরিমাণ তাঁর ১০৪ ডিগ্রি। কথা বলার শক্তি এখনও তাঁর হয় নাই।" (১৯২২ : ৯)। ১৯২৩ সালের ৭ নভেম্বর রোগভোগের পর সত্তর বছর বয়সে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। এর বছর দুয়েক পরে, ১৯২৫ সালে (মাঘ, ১৩৩২) নজরুল হুগলিতে বসে তাঁর স্মরণে রচনা করেন 'অশ্বিনী কুমার' (রফিকুল ইসলাম, ১৯৯১ : ৩৫৬)। ১৯২৬ সালে তাঁর পরিচালিত 'লাঙল' (১৯২৫) পত্রিকার প্রথম খণ্ডের সপ্তম সংখ্যায় এটি প্রথম প্রকাশিত হয় (১৯২৬ : ৩-৫)।

অশ্বিনীকুমার শিক্ষা, সংস্কৃতির ও রাজনীতির মাধ্যমে শুধু বরিশালেই নয় - নজরুলের মতে সারা বাংলায়ই নব জাগরণের সূচনা করেছেন। এজন্যে তিনি তৎকালীন বাংলার সাত কোটি মানুষের পক্ষ থেকে তাঁকে স্মরণ করেছেন,

তোমারে স্মরিণু বীর প্রাতঃস্মরণীয়
স্বর্গ হতে এ স্মরণ প্রীতি অর্ঘ্য নিও।

নজরুল লক্ষ্য করেছেন, যে বাঙালির মুক্তির জন্যে অশ্বিনীকুমার সংগ্রাম করে গেছেন। তারা তখনো 'ক্রীতদাস' 'বদ্ধকর' ও 'শৃঙ্খল বন্ধনে' বন্দী রয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, তারা পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষে ও হানাহানিতে লিপ্ত। স্মর্তব্য, এ কবিতা

রচনার প্রাকলগ্নে বঙ্গ-ভারতে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা সংঘটিত হয়েছিল। দেশের সেই পরিস্থিতিতে তাঁকে স্মরণ করার ও তার থেকে শিক্ষা নেবার যেন কেউ নেই। তাই কবি নিজেও হতাশ ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন এই ভেবে যে, "কে করিবে এ জাতির নব মন্ত্র দান?" নজরুল বলতে চেয়েছেন, পৌরুষহীনতা ও অনৈক্য দূর করতে হলে অশ্বিনীকুমারের জীবনাদর্শ থেকে শিক্ষা নিতে হবে। বাঙালিকে তিনি তেজ, শক্তি, সাহস ও দেশপ্রেমের দীক্ষা দিয়ে গেছেন। তাঁর এ অসামান্য অবদান শব্দবন্দী করেছেন কবি,

জেনেছিলে তুমি
স্বর্গাদপি গরীয়সী এই বঙ্গভূমি।
দিলে ধর্ম, দিলে কর্ম, দিলে ধ্যান-জ্ঞান,
তবু সাধ মিটিল না দিলে বলিদান
আত্মারে জননী-পদে, হাঁকিলে মা ভৈ।
ভয় নাই, নব দিন মণি ওঠে ওই।
ওরে জড়, ওঠ তোরা।

সেদিন তিনি সবার আগে জেগেছিলেন এবং সবাইকে জাগার আহ্বানও জানিয়েছিলেন, কিন্তু দেরিতে হলেও যে মুহূর্তে বাঙালি জাগতে শুরু করেছিলো ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি নেই। অথচ, জাতিকে নেতৃত্ব দেবার জন্যে তাঁরই প্রয়োজন ছিলো বেশি।

পীড়িত এ বঙ্গ পথ চাহিছে তোমার,
অসুর-নিধনে কবে আসিবে আবার।

'অশ্বিনী কুমার' কবিতায় কবি অশ্বিনীকুমার দত্তকে বাংলাদেশে গণ-মানুষের জাগরণের অগ্রদূতরূপে বিবেচনা করেছেন। তাঁর স্বদেশ প্রেমের মন্ত্রে ও বিপ্লবী প্রেরণায় বাঙালিরা যুগে যুগে উদ্বুদ্ধ হোক - এই আকাঙ্ক্ষাই কবিতাটিতে অভিব্যক্ত হয়েছে।

ইন্দু-প্রয়াণ

শরদিন্দু রায় (মৃত্যু ১৯২৩) ছিলেন বহরমপুরের প্রতিভাবান কবি। তিনি বিএ পর্যন্ত পড়েছিলেন। কবিতা ছাড়াও তিনি গান, নাটক ও রস-রচনা লেখেন এবং যথেষ্ট

শক্তিমত্তার পরিচয় দেন। সমাজের অন্যায় ও অসংগতি হাস্যরসের মাধ্যমে তুলে ধরেন তিনি। তাঁর রচিত 'হিমালয় সংগীত' বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

ব্যক্তি হিসেবেও তিনি ছিলেন হাস্যরসিক। তাঁর রচনায় তাঁর ব্যক্তিত্বের ছাপ স্পষ্ট। তাঁর সম্পর্কে সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "তিনি ছিলেন আমাদের সকলের ইন্দু দা। তিনি তাঁহার অপ্রমেয় প্রীতি–শক্তিতে সকলের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার কথাবার্তা, গান, তাঁহার অভিনয়, তাঁহার হাসি–সবার উপর তাঁহার ব্যগ্র বাহুর স্নেহবন্ধন আজও যেন অন্তরকে নিবিড়ভাবে স্পর্শ করে।" (১৩৩৯ : ২৩২)।

শরদিন্দু ছিলেন নজরুলের সমসাময়িক। সম্ভবত নজরুলের সঙ্গে তাঁর ভালো পরিচয় ছিলো। ১৯২৩ সালে যক্ষ্মারোগে তিনি অকালে মৃত্যুবরণ করেন। এ সময় নজরুল ছিলেন বহরমপুর জেলে বন্দী। তাঁর মৃত্যুর খবর শুনে জেলে বসেই তিনি রচনা করেন (শ্রাবণ, ১৩৩০) 'ইন্দু-প্রয়াণ' কবিতাটি (রফিকুল ইসলাম, ১৯৯১ : ৩৫৬)। এতে শরদিন্দুকে "হাসির কবি' বলে উল্লেখ করেছেন তিনি, 'হাসির কবিরে ডাকিব গভীরে শোক ক্রন্দন নিয়া।" এতে বোঝা যায়, তাঁর সঙ্গে নজরুলের পরিচয় ছিলো এবং তিনি তাঁর কাব্যধর্ম সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন। কবিতাটি শুরুতে তাঁর উদ্দেশে শোক জ্ঞাপনের প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন,

বাঁশির দেবতা? লভিয়াছ তুমি হাসির অমর লোক,
হেথা ঘর থেকে দুঃখী মানব করিতেছি মোরা শোক।

শরদিন্দুকে স্মরণ করে এ কবিতা রচিত হলেও স্বদেশের পরাধীনতার গ্লানি, জ্বালা ও যন্ত্রণার কথা নজরুল ভুলতে পারেন নি। তাই তাঁর মৃত্যুতে শোক ও শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েও বলেছেন, শরদিন্দু পরাধীন দেশ থেকে বিদায় নিয়ে বরঞ্চ ভালোই করেছেন। কারণ, নজরুল আপন জীবনাভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করেছেন এবং তখনো করছিলেন যে, পরাধীন দেশ কারাগার তুল্য । সেখানে সত্য কথা বলা যায় না। আর যেখানে সত্য কথা বলা যায় না সেখানে শরদিন্দুর মতো কবির বাসস্থান হতে পারে না। এখন যেখানে তিনি গেছেন সেখানে শাসনে তাঁর বাণীরুদ্ধ নয়,

ভালই করেছ ডিঙিয়া গিয়াছ নিত্য এ কারাগার,
সত্য যেখানে যায় নাক বলা, গৃহ নয় যে তোমার।

গিয়াছ যেখানে শাসনে সেখানে নহে নিরুদ্ধ বাণী,
ভক্তের তরে রাখিও সেখানে অর্ধেক আসন খানি।

রফিকুল ইসলাম যথার্থই বলেছেন, "শরদিন্দুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন প্রসঙ্গে স্বদেশের পরাধীনতায় বেদনার প্রকাশই মুখ্য।" (১৯৯১ : ৩৫৬)। শরদিন্দুর সমাজ সচেতন ও সংগ্রামী কবি-ধর্মের সংগে নজরুলের কবি-ধর্মের সাজুয্য ছিলো। নজরুল এ কবিতায় নিজেকে শরদিন্দুর 'ভক্ত' বলে উল্লেখ করেছেন এবং মৃত্যুর পরে তাঁর সংগে থাকার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন। শরদিন্দুর অকাল মৃত্যুতে তাঁর প্রতি শোক ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের সুযোগে নজরুল স্বদেশের পরাধীনতার বেদনা পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

সত্যেন্দ্র-প্রয়াণ

রবীন্দ্র যুগের অন্যতম প্রধান মৌলিক কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২)। মানবতা, দেশাত্মবোধ, সাম্যচেতনা ও অন্ত্যজ শ্রেণীর প্রতি সহানুভূতি তাঁর কবিতার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এ দিক থেকে নজরুলের সংগে ছিলো তার মানস-সাজুয্য। মৌলিক কবিতার পাশাপাশি অনুবাদ কবিতায়ও তিনি দক্ষতা ও স্বাতন্ত্র্যের ছাপ রেখেছেন। শব্দ ও ছন্দেও তিনি স্বতন্ত্র, উজ্জ্বল। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সবিতা' ১৯০০ সালে ছাত্রাবস্থায় প্রকাশিত হয়। এরপর তিনি একে একে রচনা করেন 'বেনু ও বীণা' (১৯০৬), 'হোম-শিখা' (১৯০৭), 'ফুলের ফসল' (১৯১১), 'কুহু ও কেকা' (১৯১২), 'তুলির লিখন' (১৯১৪), 'অভ্র আবীর' (১৯১৬) 'শেষের গান' (১৯১৭) ও 'হসন্তিকা' (১৯১৭) কব্যগ্রন্থ। এ ছাড়া 'তীর্থ-সলিল' (১৯০৮), 'তীর্থ-রেণু' (১৯১০) ও 'মণি-মঞ্জুষা' (১৯১৫) নামে তিনটি অনুবাদ কাব্যগ্রন্থও রচনা করেন তিনি।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত নজরুলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। নজরুলের প্রিয় কবিদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তাঁরা দু'জনেই কলকাতার সাহিত্যিক আড্ডা 'ভারতী আড্ডা' ও 'গজেনদার আড্ডা'য় যেতেন। সত্যেন্দ্রনাথ দৃষ্টিহীনতার বেদনা প্রকাশ করে 'খাঁচার পাখি' কবিতাটি রচনা করলে নজরুল তা পাঠ করে রচনা করেন 'দীল দরদী' কবিতাটি। সত্যেন্দ্রের কবিতা ও কাব্যরীতি নজরুলের কাব্যসাধনাকে নানাভাবে প্রেরণা জুগিয়েছে। (রফিকুল ইসলাম, ১৯৯১ : ৩০০)।

১৯২২ সালের ২৫ জুন, (ব্রংকাইটিস রোগে আক্রান্তে হয়ে) মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মৃত্যুবরণ করেন। ঐ দিন কলেজ স্কয়ারের স্টুডেন্টস হলে

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬–১৯৩৮) সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শোকসভার জন্যে নজরুল রচনা করেন 'সত্যেন্দ্র–প্রয়াণগীতি' [চল চঞ্চল বাণীর দুলাল] এবং ঐ সভায় তা গেয়ে শোনান (রফিকুল ইসলাম, ১৯৯১ : ৭৬)। সত্যেন্দ্রের মৃত্যুতে নজরুল একটি নাতিদীর্ঘ আবেগপূর্ণ সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখে জমা দেন 'সেবক' (১৯২২)–এ। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬–১৯৫৪) ও আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯৭–১৯৭৮) এটি কাঁচিকাটা করে প্রকাশ করলে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে সেবক ছেড়ে দেন (রফিকুল ইসলাম ১৯৯১ : ৭৫)।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যু তাঁর মনে দাগ কাটে। তিনি তাঁর স্মরণে গান বা সম্পাদকীয় লিখেই ক্ষান্ত হননি, 'সত্যেন্দ্র–প্রয়াণ' নামে একটি দীর্ঘ কবিতাও রচনা করেন। কবিতাটি 'বিজলী' ৯১৯২০) পত্রিকায় দ্বিতীয় বর্ষ তেত্রিশতম সংখ্যায় (১৯২২) প্রথম প্রকাশিত হয় (ঐ, ৭৬)।

'সত্যেন্দ্র–প্রয়াণ' কবিতায় নজরুল কবি সত্যেন্দ্রনাথকে 'মঙ্গল দীপশিখা' ও 'বঙ্গ বাণীর আলো' বলে অভিহিত করেছেন। এতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সত্যেন্দ্রের চারিত্রিক ধর্ম ও তাঁর পরিচয়। তিনি বলেছেন, তাঁর মৃত্যুতে 'মঙ্গল দীপশিখা' ও 'বঙ্গ–বাণীর আলো' নিভে গেলো। ফলে চারদিকে নেমে এলো অন্ধকার ও কাতর কান্নার রোল। তাঁকে হারিয়ে দেশমাতা শোকে মুহ্যমান। তাই কবি তাঁকে এ বলে সান্ত্বনা দিচ্ছেন যে, সত্যেন্দ্র অমর – সে শিশু হয়ে পুনঃ ফিরে আসবে,

> কাঁদিসনে মাগো, ঐ তোর ছেলে মাতা সারদার কোলে,
> শিশু হয়ে পুনঃ দুধ–হাসি হেসে তোরে ডেকে ডেকে দোলে
> সত্য, অমর, কাঁদিও না কেহ, আসিবে আবার রবি,
> মা বীণাপাণির সোহাগ আনিতে স্বর্গে গিয়াছে কবি।

সত্য–কবি

'ভারতী' (১২৮৪) পত্রিকার সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি সংখ্যায় (ছেচল্লিশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যায়) প্রকাশের জন্যে নজরুল রচনা করেন 'কবি সত্যেন্দ্র' কবিতাটি এবং এটি ঐ পত্রিকায় উল্লিখিত সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। (রফিকুল ইসলাম, ১৯৯১ : ৭৬) কবিতাটি পরে 'সত্য কবি' নামে 'ফণিমনসা' (১৯২৭) কাব্যভুক্ত হয়।

'সত্য-কবি' কবিতায় নজরুল সত্যেন্দ্রনাথের অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি তাঁর কাব্য-কীর্তি ও চারিত্রিক গুণাবলি তুলে ধরেছেন। সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-কীর্তির একটি অনিন্দ্যসুন্দর পরিচয় দিয়েছেন তিনি,

'তুলির লিখন' লেখা সে এখনো অরুণ-রক্ত-রাগে,
ফুল্লে হাসিছে 'ফুলের ফসল' শ্যামার সবজি-বাগে।
আজিও 'তীর্থ-রেণু ও সলিলে', 'মণি-মঞ্জুষা' ভরা
'বেণু-বীণা' আর 'কুহু-কেকা' রবে আজো শিহরায় ধরা,
জ্বলিয়া উঠিল 'অভ্র আবির' ফাগুয়ায় 'হোম-শিখা'
বহ্নি-বাসরে টিটকারী দিয়ে হাসিল 'হসন্তিকা'—
এতসব যার প্রাণ-উৎসব সেই আজ শুধু নাই,
সত্য প্রাণ সে রহিল অমর, মায়া যাহা হল ছাই।

ভীরুতা, কাপুরুষতা, কদর্যতা, লোভ ও যশঃচিন্তা তাঁকে কখনো স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি আপন আদর্শে ও বিশ্বাসে ছিলেন অটল। তিনি আত্মসম্মান ও ব্যক্তিত্ব সমুন্নত রেখেছেন আমৃত্যু। প্রয়োজনে অপশক্তির বিরুদ্ধে-বিনাশে একাই বাজিয়েছেন রণ-দুন্দুভি। সত্যেন্দ্র-চরিত্রের এ গুণ বর্ণনায় বাঙ্ময় কবি-কণ্ঠ,

করোনি বরণ দাসত্ব তুমি আত্ম-অসম্মান,
নোয়ায়নি মাথা চির-জাগ্রত ধ্রুব তব ভগবান।
সত্য তোমার পর-পদানত হয়নি ক' কভু, তাই
বলদর্পীর দণ্ড তোমায় স্পর্শিতে পারে নাই।
যশ-লোভী এই অন্ধ ভণ্ড সজ্ঞান ভীরু-দলে
তুমিই একাকী রণ-দুন্দুভি বাজালে গভীর রোলে।

সত্যেন্দ্রনাথ অন্যায় ও অসেত্যের কাছে কোনো দিন মাথা নত করেননি বরং আত্মশক্তি দিয়ে তা প্রতিহত করার চেষ্টাই করেছেন। বাঁশী ও বিষাণে অর্থাৎ কাব্য-কথার মাধ্যমে তিনি মানুষকে আঘাত করে জাগ্রত করতে চেয়েছেন। সত্য সমুন্নত রাখতে তিনি নির্ভীক ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি প্রতিষ্ঠিতদের পরোয়া করেননি কখনো এবং যা সত্য তা স্পষ্ট করে বলে গেছেন এবং সে সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যে মাথা

উঁচু করে দাঁড়িয়েছেন। ভয়-ভীরুতা ও স্বার্থ সন্ধানীর এই দেশে তিনি ছিলেন প্রতিবাদী কণ্ঠ। সত্যেন্দ্র-চরিত্রের এ মানবিক গুণরাজি সরল ভাষায় তুলে ধরেছেন কবি,

যশের মানের ছিলে না কাঙাল, শেখোনি খাতিরদারী,
উচ্চকে তুমি তুচ্ছ করোনি, হওনি রাজার দ্বারী।
অত্যাচারকে বল নি ক' দয়া, বলেছ অত্যাচার,
গড় করো নি ক' নিগড়ের পায়, ভয়েতে মানোনি হার।
অচল অটল অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়গিরি তুমি
উরিয়া ধন্য করেছিলে এই ভীরুর জন্মভূমি।

এই কৃতী মানুষের অকাল মৃত্যু দেশের অপূরণীয় ক্ষতি। দেশে যে মুহূর্তে এ জাতীয় মানুষের প্রয়োজন আরো বেশি করে অনুভূত হচ্ছিল ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি চলে গেলেন। অশ্রুসিক্ত কবি তাঁকে সম্বোধন করে এ কথাই বলেছেন,

চোখে জল আসে, হে কবি পাবক, হেন অসময়ে গেলে
যখন এদেশে তোমারি মতন দরকার শত ছেলে।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সংগে ব্যক্তিগত পরিচয় ও সম্পর্ক ছাড়াও নজরুলের মানসিক সাজুয্য ছিলো। তাই তাঁর মৃত্যুতে তিনি অধিকতর বেদনাহত হয়েছেন।

মিসেস এম রহমান

মিসেস এম রহমান (মিসেস মাসুদা রহমান) (১৮৮৪-১৯২৬) ছিলেন তৎকালীন বাঙালি মুসলমান সমাজের অন্যতম উচ্চ শিক্ষিত মহিলা। সমাজ-সংস্কারক ও সাহিত্যিক হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। লেখনীর ও সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি নারীমুক্তির দাবি উর্ধ্বে তুলে ধরেন। তাঁর লিখিত ও অসম্পূর্ণ উপন্যাস 'মা ও মেয়ে'। তাঁর মৃত্যুর পর 'চানাচুর' নামে তাঁর প্রবন্ধের সংকলন প্রকাশিত হয় (১৯২৮)। কবি-জীবনের প্রথম পর্বেই তাঁর সংগে নজরুলের পরিচয় ঘটে। তিনি নজরুলকে শ্রদ্ধা করতেন, আবার নজরুলও তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। নজরুলের

সম্পাদনায় 'ধূমকেতু' প্রকাশিত হলে তিনি তাঁকে 'শ্রদ্ধাস্পদ 'ধূমকেতু' সারথী'[১] সম্বোধনে অভিনন্দন জানান যা কিনা এ পত্রিকার দশম সংখ্যায় প্রকাশিত হয় (১৯২২ : ১১)। এ ছাড়া 'ধূমকেতু'র বিভিন্ন সংখ্যায় নারীমুক্তি বিষয়ক তাঁর তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।[২] সম্ভবত লেখালেখি সূত্রে নজরুলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে।

পরবর্তীকালে তাঁদের মধ্যে মাতা-পুত্রের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। রক্ষণশীল হিন্দু, ব্রাহ্ম ও মুসলমানদের প্রবল বাধার মুখেও নজরুল ব্রাহ্ম মেয়ে আশালতা সেনগুপ্তাকে (১৯০৮-৬২) বিয়ে করেন (১৯২৪)। এ বিয়ের ব্যাপারে মিসেস এম রহমান সার্বিক সহযোগিতা করেন, এমন কি বিয়ে অনুষ্ঠানের সমস্ত দায়িত্ব তিনিই বহন করেন (রফিকুল ইসলাম, ১৯৯১ : ১০৩)। এর ফলে তাঁর প্রতি নজরুলের কৃতজ্ঞতা বোধ বেড়ে যায় এবং তিনি তাঁকে মাতৃজ্ঞান করতে থাকেন। এর মাস দু'য়েক পরে প্রকাশিত তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'বিষের বাঁশী' মিসেস এম রহমানকে তিনি উৎসর্গ করেন। তাতে দু'জনের মধ্যেকার সম্পর্কের দিকটি স্পষ্টত প্রকাশ পায়। ঐ উৎসর্গ-পত্রে নজরুল মিসেস রহমানকে 'নাগমাতা' ও নিজেকে 'নাগশিশু' বলে অভিহিত করেন। উৎসর্গ পত্রের সম্বোধন অংশে তাঁর যে বিশেষণ ও পরিচয় দিয়েছেন, তাও স্মতর্ব্য,

'বাঙলার অগ্নি-নাগিনী মেয়ে মুসলিম মহিলা-কুল-গৌরব
আমার জগজ্জননী স্বরূপা মা
মিসেস এম রহমান সাহেবার পবিত্র চরণারবিন্দে'

১৯২৬ সালের ২০ ডিসেম্বর মিসেস এম রহমানের মৃত্যু হলে নজরুল ও তাঁর পরিবারে শোকের ছায়া নেমে আসে। কৃষ্ণনগর থেকে 'সওগাত'-সম্পাদক মোহাম্মদ

---

১. শ্রদ্ধাস্পদ "ধূমকেতু" সারথি !
অনেক দিন আগে আমি আপনাকে খেতাব দিয়েছিলাম "বাঁধন ছেঁড়া", আজ দিলাম "সত্য সাধক", সত্যের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করন ইহাই প্রার্থনা।

মিসেস এম. রহমান

[ক]. আমাদের অভাব-অভিযোগ (১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ১৯২২ : ১০)

[খ] আমাদের দাবী : (১ম বর্ষ, ১০ম সংখা, ১৯২২ : ৮)

[গ] আমাদের স্বরূপ : (১ম বর্ষ, ১৩শ সংখ্যা, ১৯২২ : ৯-১০)

নাসিরউদ্দীনকে (১৮৮৮–১৯৯৪) এক পত্রে তিনি লেখেন,

> '....আমি গাজী আবদুল করিমের বন্দী জীবন নিয়ে একটা কবিতা লিখেছিলাম, এমন সময় মা'র (মিসেস এম রহমান) মৃত্যু সংবাদ পেয়ে আমার আবার সব গুলিয়ে গেল। বাড়ীতে কান্নাকাটি পড়ে গিয়েছিল। আপন পেটের ছেলের চেয়েও বেশি স্নেহ করতেন মা আমায়। আমি তার প্রতিদান কিছুই দিতে পারিনি। আমি আজ দেউলিয়া হয়ে যেন জীবনের জোয়ার-ভাটা দেখছি শুধু। মন বড় খারাপ তাই এখন মা'র নামে যে কবিতাটি পাঠালাম – এটাই মাঘের 'সওগাতে'র প্রথমে দিয়ে দেবেন। মা আমায় ভালোবাসতেন বলেই যে এ দাবী করছি তা নয়। মুলতঃ সাহিত্যের দিক থেকেও এ দাবী করবার মত গুণ মা'র ছিল। (নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, ১৯৯৩ : ৩৮১)।

উপরে বর্ণিত ঘটনা ও লেখা থেকে মিসেস এম রহমানের প্রতি নজরুলের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে। উক্ত দৃষ্টিভঙ্গির শৈল্পিক প্রকাশ ঘটেছে তাঁর 'মিসেস এম রহমান' শীর্ষক নাম-কবিতায়। কবিতাটি তাঁর মৃত্যুর পর কৃষ্ণনগরে রচিত এবং ১৯২৭ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে 'সওগাত' পত্রিকার চতুর্থ বর্ষের অষ্টম সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয় (রফিকুল ইসলাম, ১৯৬৯ : ৪১)।

এ কবিতার কবি মিসেস এম রহমানরে জন্যে স্বতঃস্ফূর্ত শোক প্রকাশ করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্মৃতি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। তাঁর মৃত্যুতে তিনি যেন অসহায় হয়ে পড়েছেন। কারণ তিনি ছিলেন তাঁর আশ্রয়, আশা ও ছায়া। বিভিন্ন উপমা-রূপকে তিনি এ মৃত্যু শোক ও নিজের অসহায়তা প্রকাশ করেছেন। তাঁর মনে হয়েছে মিসেস রহমানের মৃত্যুতে তাঁর জীবনে 'কারবালা-মাতম' উঠেছে এবং চারদিক ঘিরে আছে 'মৃত্যু-এজিদ-সেনা।' মা ফাতেমার মৃত্যুতে হাসান-হোসেন যেভাবে কেঁদেছেন তিনিও সেভাবেই কাঁদছেন। তিনি তাঁর মনের অবস্থা শব্দবন্দী করেছেন এভাবে,

> জীবন ঘিরিয়া ধুধু করে আজ শুধু সাহারার বালি,
> অগ্নি-সিন্ধু করিতেছি পান দোজখ করিয়া খালি।
> আমি পুড়ি, সাথে বেদনাও পুড়ে, নয়নে শুকায় পানি,
> কলিজা চাপিয়া তড়পায় শুধু ভাঙা কাৎরানি।
> মাতা ফাতিমার লাশের উপর পড়িয়া কাতর স্বরে ;

হাসান-হোসেন কেমন করিয়া কেঁদেছিল, মনে পড়ে।

মিসেস এম রহমান শুধু তাঁর জননীই ছিলেন না – তিনি ছিলেন জগৎ জননীও। কবির মতে, তিনি জগতের সবাইকে আপন ভাবতেন – তাঁর কাছে সবাই ছিলো সমান। সবাই তাঁর আশ্রয় পেতো। কতো জনকে কতোভাবে তিনি পথের ঠিকানা দিয়েছিলেন তার হিসেব নেই। সত্যিকার অর্থে বটবৃক্ষের মতোই ছিলেন তিনি। তাঁর মায়া, ছায়া ও দয়া-দাক্ষিণ্য সবার জন্যে উন্মুক্ত ছিলো। তাঁর এ ঔদার্যের পরিচয় বটবৃক্ষের উপমায় বিধৃত করেছেন কবি,

ভুলে যাই বিহগ-শিশুরা এই স্নেহ বটছায়ে
আমারই মতন আশ্রয় লভি' ভুলেছে আপন মায়ে।
কত যে ক্লান্ত বেদনা দগ্ধ মুসাফির এরই মূলে
বসিয়া পেয়েছে মার তসল্লি, সব গ্লানি গেছে ভুলে।

নজরুল ইসলাম অনুভব করেছেন, মিসেস রহমান নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন পরহিতে। প্রদীপের মতো নিজে জ্বলে' সমাজকে আলোকিত করেছেন— প্রতিদান কিছুই চাননি। এই ছিলো তাঁর চরিত্র,

সকলের তুমি সেবা করে গেলে, নিলে না কারো সেবা,
আলোক সবারে আলো দেয়, দেয় আলোকেরে আলো কেবা?

মিসেস রহমান তাঁর স্বসমাজে নারীদের পর্দাপ্রথার বাড়াবাড়ি, বন্দীদশা ও দাস্যবৃত্তি দেখে বিচলিত হলেন এবং এসব কুসংস্কার ও নারী-পুরুষের বৈষম্য বিলোপে মনোনিবেশ করেন। তিনি নারী জাগরণের চেষ্টা করেছেন। ধর্মের দোহাই দিয়ে নারীদের গৃহবন্দী করে রাখা অন্যায় ও অপমানজনক। কোরান-হাদিসে এরকম কোনো স্পষ্ট নির্দেশ নেই, ইসলামি ইতিহাসেও এর কোনো নজির নেই। কিছু সংখ্যক ধর্ম ব্যবসায়ী শাস্ত্র ছেঁকে নিজেদের সুবিধা তালাশ করে, অথচ পুরুষের দুঃশাসন ও পশুপ্রবৃত্তি থেকে নারীর মুক্তি বা নারীর ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তির ব্যাপারে ধর্মের বিধান ব্যাখ্যায় তারা একেবারে নিশ্চুপ। নজরুল তাদেরকে 'মুনাফেক' বলে অভিহিত করেছেন। মিসেস রহমান এ মুনাফেকদের স্বার্থপরতা ও চুরিচামারি ধরে ফেলেছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে চালিয়েছেন অভিযান,

দিনের আলোকে ধরেছিলে এই মুনাফেকদের চুরি,
মসজিদে বসে স্বার্থের তরে ইসলামে হানা ছুরি।

আমি জানি মাগো আলোকের লাগি তব এই অভিযান,
হেরেম-রক্ষী যত গোলামের কাঁপায়ে তুলিত প্রাণ।

এ কবিতায়ও কবি তাঁকে 'নাগমাতা' ও তাঁর প্রভাবে জাগ্রতদেরকে 'নাগশিশু' বলে আখ্যাত করেছেন। এ নাগশিশুরা তাঁর মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সমাজে বিপ্লব সৃষ্টি করেছে, রক্ষণশীলদের শিরে উড়িয়েছে বিজয় পতাকা, ভেঙে ফেলেছে রক্ষণশীলতা ও বিধি-নিষেধের বেড়া। তাই কবি বলতে চান, তাঁর জন্ম, সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ সার্থক হয়েছে। এবং এ জন্যে কবি তাঁর স্তোত্র গেয়েছেন।

খালেদ

ইসলাম ধর্মগ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) ছিলেন ইসলামের ঘোর শত্রু। হুদাইবিয়ার সন্ধি (৬২৮) স্বাক্ষরের পর তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে মুতার যুদ্ধে (৬২৯) অভূতপূর্ব বীরত্বের জন্যে হযরত মুহাম্মদ [সাঃ] (৫৭০-৬৩২) তাঁকে 'সাইফুল্লাহ' বা আল্লাহ্‌র অসি উপাধিতে ভূষিত করেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিকের [রাঃ] (৫৭২-৬৩৪) শাসনামলে খালেদ বিন ওয়ালিদ স্বীয় যোগ্যতায় সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি বীরত্বে, সাহসে ও কৌশলে একে একে বিদ্রোহী বনি হানিফা-উপজাতি, পারস্য ও রোমানদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। তিনি জীবনে কোনো যুদ্ধে পরাজিত হননি। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রদর্শনেও তিনি কুণ্ঠিত হতেন না। পরবর্তী খলিফা হযরত, ওমর ফারুকের [রাঃ] (৫৮৩-৬৪৪) শাসনামলেও তিনি কয়েকটি যুদ্ধে অংশ নিয়ে বীরত্ব ও নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর ঔদ্ধত্যও প্রকাশ পায়। এমনকি তাঁর বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে মানুষ তাঁকে দেবতাজ্ঞান করতে শুরু করে। এসব কারণে এবং আরো অন্যকিছু সুনির্দিষ্ট অভিযোগে খলিফা ওমর (রাঃ) তাঁকে সেনাপতি পদ থেকে অপসারণ করে ইবনে সাদের নেতৃত্বে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেন। তিনি নির্দ্বিধায় সে নির্দেশ মেনে নেন। খালেদের বীরত্ব, সংগ্রামশীলতা ও আনুগত্য সম্পর্কে নজরুল অবহিত ছিলেন। তাঁর এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাঁকে আকৃষ্ট করেছে। তিনি বীরত্বের প্রতীক হিসেবে তাঁকে বিবেচনা করতেন। যেমন করতেন অর্জুনকে। তৎকালীন ভারতের ঘুমন্ত ও অধঃ-পতিত মুসলমানদের সম্মুখে খালেদের সংগ্রামী চরিত্র তুলে ধরাই ছিলো 'খালেদ' কবিতা রচনার মুখ্য প্রেরণা।

'সওগাত' পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যার জন্যে নজরুলের কাছ থেকে লেখা আনার দায়িত্ব পড়ে খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীনের (১৯০১-৮১) উপর। তিনি নজরুলের কাছ থেকে 'বার্ষিক সওগাত' নামে একটি কবিতা নিয়ে অফিসে আসলে সবাই খুশি হন। সওগাত অফিস থেকে তাঁকে নজরুলের কাছ থেকে আরো একটি কবিতা আনতে বলা হলে তিনি আবার কৃষ্ণনগরে নজরুলের বাসায় যান। তখন নজরুল জ্বরে আক্রান্ত থাকা সত্ত্বেও সওগাতের অনুরোধে কলম ধরেন। দশ বারো লাইন লিখে আর পারলেন না। লেপ গায়ে শুয়ে পড়লেন। কিন্তু তার মধ্য থেকেই আদেশ দিলেন কাগজ-কলম দেবার জন্যে। কোনো মানা-নিষেধ শোনেননি। ঘন্টাখানেক পরে জন্ম নিলো বিখ্যাত 'খালেদ' কবিতা। ১৯২৬ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসেই সওগাত পত্রিকার সপ্তম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় 'খালেদ' কবিতাটি 'বার্ষিক সওগাত'সহ প্রথম প্রকাশিত হয় (রফিকুল ইসলাম ১৯৬৯ : ৪০)।

একশ চুরানব্বই পঙক্তি বিশিষ্ট এ দীর্ঘ কবিতায় নজরুল খালেদের অসম সাহস ও বীরত্বের পরিচয় তুলে ধরেছেন এবং একই সংগে বঙ্গভারতীয় হীনবীর্য ও পশ্চাদপদ মুসলমানদের মধ্যে খালেদের গুণাবলি অর্জনের প্রেরণা সঞ্চারের চেষ্টা করেছেন। নজরুলের উপলব্ধি ছিলো এই অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে বীরোচিত সংগ্রাম ছাড়া শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। খালেদ অনেক অত্যাচারী রাজার পতন ঘটিয়ে মানুষকে শান্তি ও মুক্তি দিয়েছেন। তাই অজ্ঞ, অধঃপতিত ও উপনিবেশ-শৃঙ্খলিত তাঁর স্বদেশের মানুষের মধ্যেও খালেদের মতো বীরপুরুষের আগমন কামনা করেছেন তিনি। তাঁর দৃষ্টিতে খালেদ শুধু মুসলমানদেরই নন, বরং তিনি সারা বিশ্বের মজলুম মানুষের মুক্তিদাতা। বিশ্বের মজলুম মানুষেরা এখনো তাঁকে জেগে উঠে নেতৃত্ব দেবার আহ্বান জানাচ্ছে। খালেদ যে মৃত এ সত্য মেনে নিতে তিনি কুণ্ঠিত। তাঁর ধারণা আজরাইল তাঁর মতো এতোবড় বীরের প্রাণ কেড়ে নিতে পারেন না,

খালেদের প্রাণ কবজ করিবে ঐ মালেকুল মৌৎ?

অত্যাচারী রাজা-বাদশা ও তাঁদের সাঙ্গ-পাঙ্গদের নিপীড়ন থেকে মজলুম মানুষকে বাঁচানোর জন্যে বীর বেশে এগিয়ে এলেন যে খালেদ কবি তাঁর বীরত্বের বর্ণনায় উন্মুখর,

এমন সময় আসিল জোয়ান হাথেলিতে হাথিয়ার,
ঋর্জুর-শিষে ঠেকিয়াছে গিয়া উঁচা উষ্ণীষ তার।

কব্‌জা তাহার সব্‌জা হয়েছে তল্‌ওয়ার-মুঠ ড'লে,
দু'চোখ ঝলিয়া আশার দজলা ফোরাতে পড়িছে গলে
বাজুতে তাহার বাঁধা কোর-আন, বুকে দুর্মদ বেগ,
আল্ বোর্‌জের চূড়া গুঁড়া-করা দস্তে দারুণ তেগ।
নেজার ফলক উল্কার সম উগ্রগতিতে ছোটে,
তীর খেয়ে তার আসমান-মুখে তারারূপে ফেনা ওঠে।
দারাজ দস্ত যেদিকে বাড়ায় সেই দিক পড়ে ভেঙে
ভাস্কর-সম যেদিকে তাকায় সেই দিক ওঠে রেঙে।

তাঁর এ বীরত্ব ও বিজয়ের বার্তা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লে অত্যাচারী রাজা-বাদশারা ভীত ত্রস্ত হয়ে পড়লেন,

পারস্য রাজ নীল হয়ে উঠে ঢলে পড়ে সাকি পাশে।
রোম-সম্রাট শারাবের জাম-হাতে থরথর কাঁপে
ইস্তাম্বলী বাদশার যত নজ্জুম আয়ু মাপে।

তাঁর এ রণ-নৈপুণ্যে, বীরত্বে ও ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে মানুষ হয়তো তাঁকে সিজদা করে বসবে - প্রধানত একথা ভেবেই খলিফা ওমর [রাঃ] তাঁকে সেনাপতির পদ থেকে সরিয়ে দিলেন এবং নির্দেশ দিলেন,

সা'দের অধীনে করিবে যুদ্ধ হয়ে সাধারণ সেনা ;

খালেদ তা নির্দ্বিধায় মেনে নিলেন। খালেদ চরিত্রের আনুগত্য, শৃঙ্খলা ও আদর্শ নিষ্ঠার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করার জন্যেই হয়তো কবি এখানে তাঁর সেনাপতি পদ থেকে অপসারণের অন্য অভিযোগুলো[৩] উহ্য রেখেছেন।

---

৩. খালেদের বিরুদ্ধে হযরত ওমর ফারুক অন্য যেসব অভিযোগ আনেন সেগুলো হলো - ৬৩৮ সালে তাঁর অধীনে পরিচালিত যুদ্ধের আয়-ব্যয়ের হিসাব দিতে অস্বীকৃতি, সিরিয়ায় দুর্ভিক্ষকালে জীনক কবিকে বীরত্ব গাঁথার জন্যে ১০০০ দিনার দিলে খলিফা ওমর তার কৈফিয়ত চান, কিন্তু তিনি তার জবাব দিতে অস্বীকৃতি জানান, গনিমতের সম্পত্তির হিসেবে গড়মিল ও আত্মসাতকরণ, রিদ্দার যুদ্ধে নেবোয়ারা

এ কবিতায় দেখা যায়, খালেদ চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো বীরত্ব, রণ-নৈপুণ্য, ত্যাগ স্বীকার ও আনুগত্যবোধ। এ চারিত্রিক গুণেই তিনি প্রতিটি যুদ্ধে জয়ী হতে পেরেছেন। অথচ নজরুল আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন, তাঁর স্বদেশের মুসলমানরা 'ইসলাম' বলতে বোঝে শুধু নামাজ, রোজা, শেরওয়ানি, চোগা, তসবি ও টুপি। তাদের চরিত্রে বীরত্ব নেই, আছে ভীরুতা ; কাজকর্ম ছেড়ে তারা শুধু মোনাজাতে মগ্ন। স্বাধীন চিত্ততা মুসলমানদের প্রধান ধর্ম, অথচ ভারতের মুসলমানরা পরাধীনতার শৃঙ্খলে সুখবোধ করে। তাঁর মতে, পরাধীন দেশে ধর্মকর্ম করাই নিষিদ্ধ। পরাধীনতার বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করাই হলো পরাধীন দেশের মুসলমানদের প্রধান কাজ।

তৎকালীন বঙ্গ-ভারতের মুসলমানরা শুধু পরাধীনতার নাগপাশে বন্দী জীবনযাপনই করেনি, উপরন্তু তারা নানা কুসংস্কার, ফতোয়াবাজি ও বিভিন্ন মাজহাবে-মতাদর্শে বিভক্ত ছিলো। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা চর্চাতেও তারা বিমুখ ছিলো। নজরুল আলোচ্য কবিতায় প্রসঙ্গান্তরে ঐ মুসলমানদের বাস্তব অবস্থা অপূর্ব শৈল্পিক সৌকর্যে তুলে ধরেছেন,

বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে আমরা তখনো বসে,
বিবি তালাকের ফতোয়া খুঁজেছি ফেকা ও হাদিস চষে।
হানাফী ওহাবী মাজহাবীর তখনো মেটেনি গোল,
এমন সময় আজাজিল এসে হাঁকিল তল্‌পি তোল্‌।
ভিতরের দিকে যত মরিয়াছি, বাহিরের দিকে তত
গুণতিতে মোরা বাড়িয়া চলেছি গরু-ছাগলের মত।

নজরুল লক্ষ্য করেছেন বঙ্গ-ভারতের মুসলমানদের মতো অন্যান্য দেশের মুসলমানদের অবস্থাও একই রকম প্রায়। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্যে দুধারী তলোয়ার হাতে বীর খালেদের মতো নেতা প্রয়োজন। মুসলমানদের মধ্যে তিনি সে ধরনের নেতার আবির্ভাবই কামনা করেছেন। বিশ্ব মজলুমের আকাঙ্ক্ষাও তা-ই। কবিতাটির শেষ দু পঙক্তিতে এ আকাঙ্ক্ষার বাঙ্ময় অভিব্যক্তি লক্ষ্যযোগ্য,

---

আত্মসমর্পণ করলেও তাঁকে হত্যা করেন ও তাঁর সুন্দরী স্ত্রী লায়লকে বিয়ে করেন।

খোদার হাবিব বলিয়া গেছেন আসিবেন ঈশা ফের,
চাই না মেহ্‌দী, তুমি এস বীর হাতে নিয়ে শমশের।

এ কবিতাটি খালেদ স্মরণে রচিত হলেও তিনি উপলক্ষ মাত্র, লক্ষ্য ছিলো কবির স্বদেশের হীনবীর্য মৃত প্রায় মুসলমান। বিশ্বে যে নবজাগরণ ও স্বদেশে যে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়েছে, তাতে যাতে অজ্ঞানতা, ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারের উর্দ্ধে উঠে মুসলমানরাও শরিক হতে পারে, বীর বিক্রমে নেতৃত্ব দিতে পারে সেই প্রেরণা সৃষ্টি আকাঙ্ক্ষা কবিতাটিতে মর্মরিত।

খালেদের চরিত্রাদর্শ নজরুলকে এমনই আকর্ষণ করেছে যে, তিনি তাঁর দ্বিতীয় ছেলের নামের এক অংশ এ মহাবীরের নাম থেকেই চয়ন করে নামকরণ করেন অরিন্দম খালেদ (১৯২৬-৩০)। উল্লেখ্য যে, এ নামের প্রথম অংশ অরিন্দমও একটি বীর চরিত্র যা কিনা 'মহাভারত' থেকে চয়ন করা হয়েছে। এর পরেও নজরুল তাঁর কোনো কোনো রচনায় বীরের প্রতীক রূপে খালদের নাম উল্লেখ করেছেন।

জগলুল পাশা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার মিশরে সামরিক শাসন জারি করে (২ নভেম্বর ১৯১৫)। যুদ্ধকালীন সময়েও এ্যাংলো-তুর্ক সম্পর্কের উন্নতি ঘটেনি। এ সময় ন্যাশনাল পার্টির (১৮৭৯) নেতৃবৃন্দ ও কর্মীদের অনেককে গ্রেফতার করা হয় ও কাউকে কাউকে নির্বাসনে পাঠানো হয়। যুদ্ধের পর জগলুল পাশা (১৮৪৯-১৯২৭) ওয়াফ্‌দ পার্টি গঠন করেন ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে মিশরের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করেন (Mahud Zaid, 1965 : 82)। যুদ্ধ-পূর্বকালে তিনি মিশরে শিক্ষামন্ত্রী ও পরে বিচারমন্ত্রী ছিলেন। খোদিভ[৪] ও ব্রিটিশ রাজনীতির আইনগত বৈধতা প্রশ্নে তিনি ১৯১২ সালে পদত্যাগ করেন। (Ibid, 79-80)। এ কারণে জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে তাঁর একটা ভাবমূর্তি গড়ে ওঠে। তাঁর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আন্দোলনের মুখে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে সহ ওয়াফ্‌দ পার্টির তিন নেতাকে মাল্টায় নির্বাসিত করে (৮ মার্চ, ১৯১৯)। এর ফলে আন্দোলন সহিংসরূপ ধারণ করে। পরে ৭ এপ্রিল তাঁদের মুক্তি দেয়া হয়। এরপরও

৪. মিশরের সুলতানের উপাধি ছিলো 'খোদিভ'। পরে মোহাম্মদ আলী কর্তৃক খোদিভের পরিবর্তে 'রাজা' উপাধি গ্রহণ করা হয়।

জগলুলকে আবার বন্দী ও নির্বাসিত করা হয় (সিসিলিতে)। সেখান থেকে তিনি জিব্রাল্টায় যান (১৯২২)। এই ফাঁকে মিশরে সংবিধান প্রণয়ন ও নির্বাচনী আইন তৈরি হলো এবং তার অধীন নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হলো। ১৯২৩ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং ব্যাপক গণ-সংবর্ধনা পান (Ibid, 114-15)।

১৯২৪ সালের (জানুয়ারি) সাধারণ নির্বাচনে জগলুলের নেতৃত্বে ওয়াফ্‌দ পার্টি নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা[৫] লাভ করে (মুসা আনসারী, ১৯৯৮ : ১৪১) তাঁর নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠিত হয় এবং তিনি প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন (মার্চ, ১৯১২৪)। ২৮ জুন (১৯২৪) তিনি সংসদে ঘোষণা করেন যে, মিশর জাতি কখনো সুদান ত্যাগ করবে না এবং তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, এ ব্যাপারে ব্রিটিশের সংগে তিনি কোনো প্রকার আপোষ করবেন না। পরের দিন তিনি ব্রিটিশ নীতির প্রতিবাদে পদত্যাগ করেন। পরে জিওয়ার পাশার নেতৃত্বে স্বল্পমেয়াদি মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। ১৯২৬ সালের (জানুয়ারি) নির্বাচনেও তাঁর নেতৃত্বে ওয়াফ্‌দ পার্টি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। এবার ব্রিটিশ নীতির সংগে সংঘাত এড়াতে তিনি নিজে সরকার গঠন না করে আদলী ইয়াকেনের নেতৃত্বে একটি কোয়ালিশন সরকার গঠনের ব্যবস্থা করেন। নিজে সংসদে স্পিকারের পদ গ্রহণ করেন (মুসা আনসারী, ১৪৪)। ১৯২৭ সালে (এপ্রিল) শিল্পায়ন প্রশ্নে আদলী পদত্যাগ করলে আবদুল খালেক সারওয়াতকে সরকারের দায়িত্ব দেয়া হয়। এর ক'দিন পর (২৩ আগস্ট) জগলুল পাশা বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন (এস, এম, হাসান, ১৯৮৯ : ১৮০)।

মিশরের স্বাধীনতা আন্দোলনের শুরু থেকে নজরুলের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হয়েছে। তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা জগলুল পাশার প্রতি স্বাভাবিকভাবেই সহানভূতিশীল ছিলেন। 'ধূমকেতু' পত্রিকায় অষ্টম ও চতুর্দশ সংখ্যায় জগলুল পাশার নির্বাসিত জীবনের ওপর দু'টি সংক্ষিপ্ত সংবাদ ছাপা হয় (১৯২২ : ৮, ৭)। তার একটিতে তাঁকে 'মিশরের জাতীয় আন্দোলনের প্রবর্তক' বলে অভিহিত করা হয় (চতুর্দশ সংখ্যা, ১৯২২ : ৭)। এ ছাড়াও অষ্টাদশ সংখ্যায় 'মক্কামোয়াজ্জায় [মোয়াজ্জমায়] জগলুল পাশার জন্য প্রার্থনা' শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় (১৯২২ : ১০)।

---

৫. ২১৪টি আসনের মধ্যে জগলুল পাশার নেতৃত্বাধীন ওয়াফ্‌দ পার্টি পায় ১৯০টি আসন। ১৯২৬ সালের নির্বাচনে এ পার্টি ১৬৫টি আসন পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে (মুসা আনসারী, ১৯৮৮ : ১৪১–৪৪)।

তাঁর মৃত্যুর পর নজরুল কৃষ্ণনগরে বসে 'চিরঞ্জীব জগলুল' কবিতাটি রচনা করেন। ঐ সময়ে এটি 'নওরোজ' পত্রিকার প্রথম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয় (রফিকুল ইসলাম ১৯৬৯ : ৪৬)।

এ কবিতায় কবি জগলুল পাশাকে শুধু মিশরের নয় – বিশ্ব মজলুমের মুক্তিকামী চিরঞ্জীব নেতারূপে বর্ণনা করেছেন, তাঁর জীবনের সংগ্রামশীল কাহিনি উল্লেখ করেছেন এবং একই সঙ্গে তাঁর জন্যে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি কবি তাঁর নিজ দেশের পরাধীনতার কথাও ব্যথিত চিত্তে প্রকাশ করেছেন এবং আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন, জগলুলের মতো সংগ্রামী নেতা তাঁর দেশেও আবির্ভূত হোক।

জগলুল পাশা মিশরের 'শের শির শমসের' ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে তাই মিশর হয়েছে সর্বহারা। তাঁর মৃত্যু শোকে মুহ্যমান মিশরের মানুষ ও প্রকৃতি। আকাশে, বাতাসে, এমনকি সূর্যেও শোকের মাশুম শোনা যায়। কবির মনে হয়েছে যেন মিশরে রোজ–কেয়ামত নেমে এসেছে।

কিছুদিন পূর্বে সুদান হারিয়ে মিশরিরা শোকাচ্ছন্ন হলেও জগলুলকে তাদের মাঝে পেয়ে তারা সে শোক ভুলে গিয়েছিল,

মিসরে খেদিব ছিল বা ছিল না ভুলেছিল সব লোক,'
জগলুলে পেয়ে ভুলেছিল ওরা সুদান হারার শোক।

উপমা প্রয়োগ করে কবি বলেছেন, সোহরাবের সংগে যুদ্ধে রুস্তম যে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন, বা ফেরাউনের সংগে যুদ্ধে মুসা (আঃ) যে কৌশলের পরিচয় দিয়েছেন ব্রিটিশের সংগে যুদ্ধেও জগলুল ঠিক সেইরূপ বীরত্ব ও কৌশলের পরচিয় দিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে মিশরের বীরত্ব ও যৌবন অবসিত হলো,

রহিল মিসর, চলে গেলে তার দুর্মদ যৌবন,
রুস্তম গেল, নিষ্প্রভ কায় খসরু–সিংহাসন।

অথবা

ফেরাউন ডুবে না মরিতে হায় বিদায় লইল মুসা,

এই কবিতায় কবি ব্রিটিশ সরকারকে 'ফেরাউন' ও তার শাসনকে 'ফেরাউনী' বলে অভিহিত করেছেন। তারা মিশরের মানুষের উপর অকথ্য নির্যাতন করতো, তাদের কারাগারে বন্দী করতো এবং মৃত্যুদণ্ড দিতো কথায় কথায়। সভ্যতার নামে তারা

জঘন্য অসভ্য আচরণ করতো। ফেরাউনের গৃহে মুসার আসার মতো মনুষ্যত্বহীন মিশরি সমাজে অতিমানুষ রূপে জগলুলের আবির্ভাব ঘটেছে কোনো এক শুভক্ষণে,

মনুষ্যত্বহীন এই সব মানুষেরই মাঝে কবে,
হে অতি-মানুষ। তুমি এসেছিলে জীবনের উৎসবে।
চারিদিকে জাগে মৃত্যুদণ্ড রাজকারা প্রতিহারী,
এরই মাঝে এলে দিনের আলোক নির্ভীক পথচারী।

কবি জগলুলকে সচেতনভাবে মুসার সংগে উপমিত করেছেন। মুসা ছিলেন আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ-নবী। তাঁর কিছু অলৌকিক শক্তি ছিলো বলে কিংবদন্তি চালু আছে। তাঁর ছিলো এক অলৌকিক লাঠি 'আশা'। তিনি ডাক দিলেই স্বর্গীয় দূত এসে হাজির হতেন এবং তিনি বিপদে পড়লে পেতেন আল্লাহ্‌র বাণী। গিরি, পর্বত, নদী ও সাগর তাঁকে সালাম জানাতো। মুসার মতো ঐ রকম ব্যক্তিত্ব বা অলৌকিক শক্তি না থাকলেও জগলুল তাঁর স্বদেশে ও বিশ্বে মানুষের শ্রদ্ধা পেয়েছেন। দেশে দেশে মানুষ তাঁর নামকীর্তন করেছে। কারণ, তাঁর মধ্যে ছিলো উন্নত মানের মনুষ্যত্ব,

তবুও এশিয়া আফ্রিকা গাহে তোমার মহিমা গান,
মনুষ্যত্ব থাকিলে মানুষ সর্বশক্তিমান।

জগলুল পরাধীন জাতিকে স্বাধীনতার পথ দেখিয়ে গেছেন। মানুষের মন জয় করে, তাদেরকে সংঘবদ্ধ করেও তাদের মনে সাহস সঞ্চার করে সশস্ত্র শত্রুকেও পরাভূত করা যায় সেই শিক্ষাই দিয়ে গেছেন তিনি,

দেখাইলে তুমি, পরাধীন জাতি হয় যদি ভয়হারা,
হোক নিরস্ত্র, অস্ত্রের রণে বিজয়ী হইবে তারা।
অসি দিয়া নয়, নির্ভীক করে মন দিয়া রণ জয়,
অস্ত্রে যুদ্ধ জয় করা সাজে - দেশ জয় নাহি হয়।

নজরুলের লক্ষ্য ছিলো এ মহান নেতার নীতি-দর্শন ও শিক্ষার দিকে নিজ দেশের (বঙ্গ-ভারতের) মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। তাই তিনি উল্লেখ করেছেন তাঁর উপনিবেশ-শৃঙ্খলিত দেশের অবস্থা। তাঁর দেশের মানুষ স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ না করে পরস্পর আত্মকলহ, হিংসা-বিদ্বেষে লিপ্ত, তাদের সম্মানবোধ ও শরম জ্ঞান

নেই, নেই মনুষ্যত্ববোধও। জগলুলের মতো মহাপুরুষদের দেখে তারা নিজেদের এ গ্লানি দূর করার প্রেরণা পেতো, উজ্জীবিত হতো স্বাধীনতার স্পৃহা ও সংগ্রামে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে কবি বলেছেন তাঁর মৃত্যুতে শোক ও দুর্দিন শুধু মিশরের জন্যেই নয় – আফ্রো-এশিয়ার মুক্তিকামী প্রতিটি দেশেরও,

তাই মিশরের নহে এই শোকে এই দুর্দিন আজি,
এশিয়া-আফ্রিকা দুই মহাভূমে বেদনা উঠছে বাজি'।

কবি এ বীরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেছেন,

হে বণি ইসরাইলের দেশের অগ্রনায়ক বীর,
অঞ্জলি দিনু, 'নীলে'র সলিলে অশ্রু ভাগীরথীর।

কবি তাঁর স্বদেশের জন্যে, স্বদেশের মুক্তির জন্যে জগলুলের আশীর্বাদ কামনা করেছেন অর্থাৎ কবি আকাঙ্ক্ষা করেছেন তাঁর দেশেও জগলুলের মতো অগ্রনায়কের আবির্ভাব ঘটুক,

মলয় শীতলা সুজলা এদেশে আশিস করিও খালি,
উড়ে আসে যেন তোমার দেশের মরুর দুমুঠো বালি।

কবিতাটির অন্তিম স্তবকে কবি অত্যন্ত কৌশলে মিশরের প্রাচীন ইতিহাস সূত্র উল্লেখ পূর্বক ব্রিটিশ শাসকদের 'ফেরাউন', 'দজ্জাল' ও জগলুলকে 'মুসা' রূপে অভিহিত করে আশাবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

মিশর হইতে বিদায় লইল মুসা যবে চিরতরে,
সম্ভ্রমে সরে পথ করে দিল 'নীল' দরিয়ার বারি,
পিছু পিছু চলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া মিশরের নর-নারী,
শ্যোন-সম ছোটে এ ফেরাউন-সেনা ঝাঁপ দিয়া পড়ে স্রোতে,
মুসা হল পার, ফেরাউন ফিরিল না 'নীল' নদী হতে।
তোমার বিদায়ে করিব না শোক, হয় ত দেখিব কাল,
তোমার পিছনে মরিছে ডুবিয়া ফেরাউন দজ্জাল।

নজরুলের এ উক্তি পরবর্তীকালে সফল হয়েছে। বহু আন্দোলন সংগ্রাম শেষে

১৯৫২ সালে জেনারেল মুহাম্মদ নগীব ক্ষমতাসীন হয়ে মিশর থেকে রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করেন এবং মিশরকে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করেন। তাঁর পরবর্তী শাসক কর্নেল নাসের মিশরের স্বাধীনতাকে পূর্ণতা দান করেন। বিশ্বের একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে নজরুল জগলুল পাশাকে স্মরণ ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন। পরবর্তীকালেও তাঁর কোনো কোনো রচনায় এ মহান নেতার নাম তিনি উল্লেখ করেছেন সংগ্রামী প্রেরণার উৎস হিসাবে।

আমানুল্লাহ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আমানুল্লাহ্ খানের (১৮৯২-১৯৬১) নেতৃত্বে আফগানিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে (৮ আগস্ট, ১৯১৯)। আমানুল্লাহ প্রথমে আফগানিস্তানের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও উপজাতি বিদ্রোহ দমন করেন। এর পরে তিনি আফগানিস্তানকে আধুনিক রাষ্ট্রে রূপান্তরের লক্ষে বেশ কিছু যুগান্তকারী সংস্কার সাধন করেন। ১৯১৯ সাল থেকে ১৯২৭ সাল (বিদেশে ভ্রমণের পূর্ব পর্যন্ত) পর্যন্ত তাঁর উল্লেখযোগ্য সংস্কাগুলো হলো - দাসপ্রথা রহিতকরণ, এতিমখানা প্রবর্তন, পুলিশ একাডেমি স্থাপন, নারীশিক্ষা ও আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ পাঠ্যক্রম প্রবর্তন, সৌর ক্যালেণ্ডার প্রবর্তন, সংবিধান রচনা ও আইনসভা গঠন, ইউরোপীয় ও এশিয়ান জাতিসমূহের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন, কর-ব্যবস্থা পুনর্গঠন ও জাতীয়করণ, শিল্প-বাণিজ্য ও কৃষি উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ প্রভৃতি (Leon B. Poullada, 1973 : 70-79)। মোল্লারা ছিলো শিক্ষা ও ধর্মীয় সংস্কারের বিরুদ্ধে, ধনীরা ছিলো শিল্প-সংস্কারের বিরুদ্ধে এবং উপজাতীয়রা ছিলো পাশ্চাত্য শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে। কিন্তু আমানুল্লাহ দৃঢ় চিত্তে সকল বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে সংস্কার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। তিনি ১৯২৬ সালে আফগানিস্তানকে সাধারণতন্ত্র ঘোষণা করেন এবং নিজে 'রাজা'র পরিবর্তে 'আমীর' পদবী গ্রহণ করেন।

১৯২৭ সালের ডিসেম্বরে তিনি সস্ত্রীক বিশ্ব সফরে বের হয়ে প্রথমে ভারতে আসেন। ভারতের সর্বত্র তাঁকে স্বাগত-সংবর্ধনা জানানো হয়। তন্মধ্যে বোম্বে শহরের সংবর্ধনাটি ছিলো অধিকতর জাঁকজমকপূর্ণ। ভারতের সংবাদপত্রগুলো এ সময় তাঁর প্রশংসা করে অনেক নিবন্ধ বের করে।

আফগানিস্তানের ঘটনাপ্রবাহ ও আমানুল্লাহর সংস্কার প্রচেষ্টা সম্পর্কে নজরুল পূর্বাপর খোঁজ খবর রাখতেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সৈনিক হিসেবে তিনি

আফগানিস্তানের প্রতিবেশী ভারতবর্ষের করাচিতে অবস্থান-সূত্রে আফগানিস্তানের পরিস্থিতি ও আমানুল্লাহর কার্যকলাপ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত ছিলেন। তাই দেখা যায় করাচি সেনানিবাসে বসে লেখা 'হেনা' (১৯১৮) গল্পের নায়ক রুস্তম আফগান আমীরের [আমানুল্লাহ] হয়ে যুদ্ধে গেছেন। ধূমকেতুর অষ্টম সংখ্যায় 'আফগান চৈতন্য-ভারত শুধুই ঘুমাইয়ে রয়' শিরোনামের সংক্ষিপ্ত সংবাদে আমীর কর্তৃক সে দেশে সমর-বিদ্যালয় খোলার উল্লেখ করা হয় (১৯২৮ : ৮)।

এই আমানুল্লাহ ভারত সফরে এলে নজরুল তাঁকে উদ্দেশ্য করে 'আমানুল্লাহ' শীর্ষক কবিতাটি রচনা করেন। এটি ১৯২৮ সালের জানুয়ারিতে 'সওগাত' পত্রিকার পঞ্চম বর্ষের অষ্টম সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয় (রফিকুল ইসলাম ১৯৬৯ : ৪৭)। এই কবিতায় কবি স্বাধীন দেশের বাদশাহ্ আমানুল্লাহকে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে তাঁর নিজ দেশের পরাধীনতার বেদনায় ও লজ্জায় শরবিদ্ধ হয়েছেন। তিনি নিজ দেশের মানুষের নিস্পৃহতা, কাপুরুষতা ও হীনবীর্যতায় বিক্ষুব্ধ হয়েছেন। তাই তাঁর স্বদেশ-ভারতভূমিকে তিনি 'পশুর কতলগাহ' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে এ পরাধীন দেশের মানুষের স্বাধীন দেশের বাদশাহকে সংবর্ধনা জানানোর কোনো অধিকার নেই। কবিতার শুরুতেই তিনি আমানুল্লাহকে অভিনন্দন জানিয়ে পরাধীন স্বদেশ ভূমির বেদনাময় চিত্র তুলে ধরেছেন,

> খোশ্ আম্‌দেদ্ আফ্‌গান শের ! অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে আজ—
> সালাম জানায় মুসলিম হিন্দু শরমে নোয়ায়ে শির বে-তাজ।
> বান্দা যাহারা বন্দেগী ছাড়া কি দিবে তাহারা শাহানশাহ্।
> নাই যে ভারত মানুষের দেশ। এ শুধু পশুর কতলগাহ্
> দস্তে তোমার দস্ত রাখিয়া নাই অধিকার মিলাতে হাত,
> রুপার বদলে দু'পায়ে প্রভুর হাত বাঁধা রেখে খায় এ জাত।

এ পরাধীন জাতির দুঃখ, দৈন্য, দুর্দশা ও কাপুরুষতা দেখে কাবুল নৃপতি লজ্জা ও বেদনায় মুখ ঢেকেছেন কিনা সে সন্দেহ জেগেছে কবির মনে,

> কাবুল-লক্ষ্মী দেহে মনে এই পরাধীনদের দেখিয়া কি
> রহিল লজ্জা-বেদনায় হায়, বোর্‌কায় তাঁর মুখ ঢাকি ?

কবির উদ্দেশ্য ছিলো আমানুল্লাহর নেতৃত্ব, সংগ্রাম ও আদর্শ চেতনা তার স্বদেশের

মানুষের মনে সঞ্চারিত করা – যাতে তারাও স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়।

প্রসঙ্গক্রমে কবি অতীতের ইতিহাসের অবতারণা করেছেন—আজ যে খায়বার গিরিপথ দিয়ে আমানুল্লাহ এসেছেন – একই পথ দিয়ে যুগে যুগে ভারতে এসেছেন সুলতান মাহমুদ, নাদির শাহ, আহমদ শাহ আবদালি ও তৈমুর লং প্রমুখ। তাঁরা এসেছিলেন ভারতের সম্পদ লুঠ করতে, নয়তো ক্ষমতা দখল করতে। সেই উদ্দেশ্য সাধনে তাঁরা এদেশের লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করেছিলেন। এদেশকে পরিণত করেছিলেন রক্তাক্ত প্রান্তরে। আজকে বাদশাহ আমানুল্লাহ কিন্তু সেই বেদনাময় ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করতে আসেন নি। তিনি এসেছেন ভারতবাসীকে শুভেচ্ছা জানাতে। একই পথে এলেও তাদের আসা ও তাঁর আসার মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। কবি সেই পার্থক্য নির্দেশ করেছেন এভাবে,

খঞ্জর এরা এনে.ছ সবাই, তুমি আনিয়াছ 'হেলাল' আজ

তোমারে আড়াল করেনি তোমার তরবারি আর তখ্ত তাজ।

বাদশাহি দম্ভ নিয়ে নয় – একজন সাধারণ পরিব্রাজক রূপে কবির ভাষায় 'মহাতীর্থ যাত্রা-পথিক' রূপে তিনি এদেশে এসেছেন। তাই এদেশবাসী তাঁকে ফুলমালা দিয়ে বরণ করে নিয়েছে।

তাঁর নেতৃত্বে আফগানিস্তানে জাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল। বিরুদ্ধ শক্তির মোকাবেলা করে তখন পর্যন্ত তিনি জয়ী হয়েছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে আফগানিস্তান শুধু স্বাধীনই হয়নি – আধুনিক রাষ্ট্র রূপেও গড়ে উঠছিলো। তাঁর কর্ম প্রচেষ্টার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ছিলো দেশে দেশে। তাঁকে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে কবি সংগত কারণে এর উল্লেখ করেছেন.

সুলেমান–গিরি হিন্দু কুশের প্রাচীর লঙ্ঘি' ভাঙি' কারা,

আদি সন্ধানী যুবা আফগান, চলেছ ছুটিয়া দিশাহারা।

সুলেমান সম উড়ন্-তখ্‌তে চলিলে করিতে দিগ্বিজয়,

কাবুলের রাজা, ছড়ায়ে পড়িলে সারা বিশ্বের হৃদয়ময়।

শমসের হতে কমজোর নয়, শিরীন্ জবান, জান তুমি,

হাসি দিয়ে তাই করিতেছ জয় আসির অজেয় রণ-ভূমি।

আমানুল্লাহ রাজা বা বাদশাহ হলেও চিন্তা-চেতনায় ছিলেন আধুনিক ও

প্রগতিশীল। এ কারণে তিনি তাঁকে স্বাগত জানান। রাজার আসন যে মানবজাতির জন্যে অসম্মানজনক এবং রাজতন্ত্র যে ইসলামের নীতি-বিরুদ্ধ সে সম্পর্কেও নজরুল সচেতন ছিলেন,

আমানুল্লারে করি বন্দনা, কাবুল রাজার গাহি না গান,
মোরা জানি ঐ রাজার আসন মানবজাতির অসম্মান।
ঐ বাদশাহী তখ্তের নীচে দীন-ই-ইসলাম শরমে হায়,
এজিদ হইতে শুরু করে আজো কাঁদে আর শুধু মুখ লুকায়।

এখানে স্পষ্টত নজরুলের ইতিহাস-চেতনা, মানবতাবোধ ও আধুনিক গণতান্ত্রিক মানসিকতার পরিচয় অভিব্যক্ত হয়েছে।

কবি তাঁকে বরণ করেছেন কেন তার স্পষ্টতর জবাবও দিয়েছেন সহজ ভাষায়, 'রাজাসন ছাড়ি' মাটিতে নামিতে দ্বিধা নাই-তাই করি বরণ।' তিনি তাঁকে আরেকটি কারণে বরণ করেছেন—তা হলো, তাঁর অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি তাঁর দেশের সকল নাগরিককে সমান দৃষ্টিতে দেখেছেন। সম্প্রদায় ভেদে ভিন্ন আচরণ করেন নি। এটি নজরুলের নিজেরও আদর্শ। সুতরাং আমানুল্লাহ চরিত্রের এ দিকটি তাঁকে আকৃষ্ট করেছে এবং তিনি তা স্পষ্টরূপে উল্লেখও করেছেন,

তোমার রাজ্যে হিন্দুরা আজো বেরাদর-ই-হিন্দ্, নয় কাফের,
প্রতিমা তাদের ভাঙোনি, ভাঙোনি এক খানি ইট মন্দিরের।

আমানুল্লাহর আধুনিক সংস্কার প্রচেষ্টা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রশংসিত হলেও এবং এজন্যে তিনি বিভিন্ন দেশে ব্যাপক সংবর্ধনা পেলেও তাঁর দেশের শিনওয়ারি মোল্লা ও উপজাতি সর্দাররা সেগুলো মেনে নিতে পারেনি। তারা দেশের সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে সংঘবদ্ধ করে এবং বাচ্চাই-সাক্কা নামক এক উপজাতি সর্দারের নেতৃত্বে কাবুল দখল করে নেয় (জানুয়ারি, ১৯২৯)। আমানুল্লাহ্ খান কান্দাহারে পালিয়ে যান এবং কাবুল উদ্ধারের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। পরে সেখান থেকে বোম্বে হয়ে ইটালিতে আশ্রয় নেন এবং আমৃত্যু সেখানেই থাকেন।

উমর ফারুক

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুক [রাঃ] (৫৮৩-৬৪৪) হযরত মুহাম্মদের (সঃ) (৫৭০-৬৩২) নবুয়ত প্রাপ্তির ষষ্ঠ বছর ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ হয়ে হযরত মুহাম্মদ তাঁকে 'ফারুক' উপাধিতে ভূষিত করেন। হযরত আবু বকর (৫৭২-৬৩৪) মৃত্যুর পূর্বে বিশিষ্ট সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে তাঁকে পরবর্তী খলিফা মনোনীত করেন।

হযরত ওমর তাঁর শাসন আমলে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের দুশমনদের দমন করতে গিয়ে পারস্য, রোম, জেরুজালেম, প্যালেস্টাইন, মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া, আবিসিনিয়া, লিবিয়া ও মিশর পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ করেন ও সেগুলোতে ইসলামি শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলেন। দায়িত্বশীলতা, সাম্য, ন্যায়বিচার ও গণতন্ত্র ছিলো এ শাসনব্যবস্থার ভিত্তিমূল। ওমরের এ শাসননীতি, বীরত্ব ও চারিত্রিক গুণাবলি নজরুলকে আকৃষ্ট করেছে এবং তারই শিল্পরূপ 'উমর ফারুক' কবিতা। তিনি এটি ১৯২৮ সালে কলকাতায় বসে রচনা করেন এবং এটি 'সওগাত' পত্রিকার দ্বিতীয় বার্ষিকী সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয় (রফিকুল ইসলাম ১৯৬৯ : ৪৮)।

এ কবিতায় হযরত ওমর ফারুকের জীবনের কিছু ঘটনা, তাঁর শাসননীতি ও চরিত্র বিধৃত হয়েছে। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে হযরত ওমর হযরত মুহাম্মদকে খুন করার জন্যে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে জানতে পারেন যে, তার বোন ও ভগ্নিপতি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এরপর তিনি তাঁদের বাড়িতে যান। সেখানে তাদেরকে রক্তাক্ত করে ফেললেও তারা ধর্মত্যাগে অস্বীকৃতি জানান। তিনি তাঁদের কাছে রক্ষিত কোরান পড়তে থাকলে তাঁর মধ্যে ভাবান্তর আসে। এরপর

উমর আনিল ইমান-গরজি' গরজি' উঠিল স্বর
গগন পবন মন্থন করি-"আল্লাহু আক্‌বর"।

অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও প্রজ্ঞাবলে হযরত আবু বকরের পরে তিনি খলিফা নির্বাচিত হন। তাঁর নীতি ছিলো দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে থেকেই তিনি রাজ্যশাসন করেছেন,

করেছ শাসন অপরাধীদের তুমি করনি ক ক্ষমা,
করেছ বিনাশ অসুন্দরের। বলনি ক মনোরমা
মিথ্যাময়ীরে। বাঁধনি ক বাসা মাটির ঊর্ধ্বে উঠি',
তুমি খাইয়াছ দুঃখীর সাথে ভিক্ষার ক্ষুদ খুঁটি।

তিনি অত্যন্ত সরল ও সাধারণ জীবনযাপন করতেন। ধন–সম্পদের কোনো লোভ করেন নি কোনো দিন। এতো বড় সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়েও তিনি খেজুর পাতার জীর্ণ গৃহে বাস করতেন। তাঁর এ সাধারণ জীবনযাপন ও নির্লোভ চরিত্র মুদ্রাংকিত করেছেন কবি,

অর্ধ পৃথিবী করেছ শাসন ধুলার তখ্‌তে বসি,'
খেজুর পাতার প্রাসাদ তোমার বারে বারে গেছে খসি'
সাইমুম–ঝড়ে। পড়েছে কুটির, তুমি পড়নি ক নুয়ে,
ঊর্ধ্বের যারা - পড়েছে তাহারা, তুমি ছিলে খাড়া ভূঁয়ে।
শত প্রলোভন বিলাস বাসনা ঐশ্বর্যের মদ
করেছে সালাম দূর হতে সব, ছুঁইতে পারেনি পদ।

এরপর কবি ওমরের জীবনের এমন কতকগুলো ঘটনা তুলে ধরেছেন যেগুলোর মধ্য দিয়ে তাঁর চারিত্রিক গুণাবলি স্পষ্টরূপে বিধৃত হয়েছে। এসব ঘটনা থেকে দেখা যায়, তাঁর চরিত্র কোমলে কঠিনে, সাম্যে, ঔদার্যে সংমিশ্রিত। একজন আদর্শ শাসকের যা যা গুণ থাকা প্রয়োজন সেগুলোর সবই ছিলো তাঁর।

৬৩৭ সালে মুসলমানরা প্যালেস্টাইন দখলের পর পবিত্র নগর জেরুজালেম অবরোধ করে। অবস্থা খারাপ দেখে শহরবাসীরা আত্মসমর্পণ করতে ব্যাকুল হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় প্রধান খ্রিস্টান ধর্মগুরু সফ্রোনিয়াস শুধু খলিফা ওমরের [রাঃ] নিকট আত্মসমপর্ণে বা সন্ধিপত্র স্বাক্ষরে রাজি বলে জানান। খবর পেয়ে তিনি একটি মাত্র ভৃত্য নিয়ে উটে চড়ে রৌদ্রদগ্ধ দূর মরুপথ পাড়ি জমালেন। কিছু দূর গিয়ে ওমর [রাঃ] ভৃত্যকে উটে ওঠার ও নিজে স্বয়ং রশি টানার প্রস্তাব করেন,

কিছু দূর যেতে উট হতে নামি কহিলে ভৃত্য ভাই,
পেরেশান বড় হয়েছ চলিয়া। এইবার আমি যাই
উটের রশি ধরিয়া অগ্রে, তুমি উঠে বস উটে,
তপ্ত বালুতে চলি যে চরণে রক্ত উটেছে ফুটে।

একথা শুনে ভৃত্যু কেঁদে ফেললো। কিন্তু খলিফা তাকে যুক্তিগর্ভ ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন যে, পৃথিবীতে সবাই সমান। জন প্রতিনিধি জনসেবক মাত্র, একা সুখ ভোগের অধিকার নেই তাঁর। ইসলাম মানুষকে এই শিক্ষাই দিয়েছে। ওমরের জবানিতে কবি

এ প্রসঙ্গটি প্রাঞ্জল ভাষায় তুলে ধরেছেন,

আমি তোমাদের প্রতিনিধি শুধু। মোর অধিকার নাই
আরাম সুখের,—মানুষ হইয়া নিতে মানুষের সেবা,
ইসলাম বলে সকলে সমান, কে বড় ক্ষুদ্র কেবা।

এরপর পালাক্রমে তাঁরা উটে চড়ে জেরুজালেম নগরিতে উপনীত হলেন। ঘটনা চক্রে সেখানে পৌছার কালে উটের পিঠে ভৃত্য এবং রশি টানছেন খলিফা স্বয়ং। অর্ধ পৃথিবীর শাসকের এই দৃশ্য দেখে খ্রিস্টানরা বিস্মিত হলো, "যার নামে কাঁপে অর্ধ পৃথবী, এই সেই উমর নাকি?"

গির্জাঘরে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হলো। এরপর ওমর নামাজ পড়ার জন্যে বাইরে যেতে মনস্থ করেন। ধর্মজাযক গির্জাঘরে নামাজ পড়তে কোনো আপত্তি নেই বলে জানালেন। দূরদর্শী ওমর জবাব দিলেন এখানে নামাজ পড়তে তাঁর আপত্তি নেই, আল্লাহ্‌রও নিষেধ নেই। কিন্তু আজ তিনি এখানে নামাজ পড়লে স্বার্থান্বেষীরা বা মুর্খরা বলে বেড়াবে খলিফা গির্জায় নামাজ পড়ার বা গির্জাকে মসজিদ করার ইশারা দিয়ে গেছে। তিনি স্পষ্ট স্বরে বলেছেন, অন্যের মন্দিরে বা গির্জায় মসজিদ নির্মাণ ইসলামের বা আল্লাহর বিধান নয়। তাঁর এ বাণী শুনে খ্রিস্টানরা বিস্ময়ে বিমূঢ় হলো, উপরন্তু, বললো – এই যদি ইসলাম হয় তা হলে তো আর কেউ এর বাইরে থাকবে না। এভাবে তিনি খ্রিস্টানদের হৃদয় জয় করলেন।

সেনাপতি খালেদ বিন ওয়ালিদ প্রতিটি যুদ্ধে বা অভিযানে বিজয় অর্জন করতে থাকেন। বীরযোদ্ধা হিসেবে তাঁর খ্যাতি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি সীমাও অতিক্রম করেন। তাঁর মধ্যে এক ধরনের অহমিকাও জাগে। তাঁর অতি জনপ্রিয়তা ও অসম সাহসিকতার জন্যে লোকে তাঁকে অতিমানব ভাবতে শুরু করে। এসব কারণে খলিফা ওমর তাঁকে পদচ্যুত করে সামান্য সৈনিকে রূপান্তরিত করেন। তাঁর এ সাহসী সিদ্ধান্তে কবি তাঁকে 'নির্ভীক' বলে সম্বোধন করেছেন এবং বলেছেন,

সিপাহসালারে ইংগিতে তব করিলে মামুলি সেনা,
বিশ্ব-বিজয়ী বীরেরে শাসিতে এতটুকু টলিলে না।

হযরত মুহাম্মদের মৃত্যুর পর কে খলিফা হবেন এ নিয়ে বিবাদ-বিরোধ যখন চরমে তখন হযরত ওমরের প্রস্তাবে হযরত আবু বকরকে সবাই খলিফা বলে মেনে

নেন। সেদিন তিনি এ প্রজ্ঞার পরিচয় না দিলে ইতিহাস অন্য রকম হতো।

ওমরের মানবপ্রেমিক রূপ তথা একজন শাসকের দায়িত্বশীলতার পরিচয়ও কবি তুলে ধরেছেন। একদিন রাত্রি ভ্রমণে বের হয়ে তিনি দেখতে পেলেন দুটি ক্ষুধাতুর শিশুকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে তাদের মা উনুনে শূন্য হাঁড়ি চড়িয়ে রেখেছেন। সকল বৃত্তান্ত শুনে তিনি বায়তুল মাল হতে খাদ্যের বোঝা নিজ পিঠে বয়ে নিয়ে হাজির হলেন সেখানে। তাঁর বোঝা বহনের জন্যে অনেকেই এগিয়ে এলেন, কিন্তু তিনি কাউকে সে সুযোগ দেননি। তিনি মনে করতেন, তাঁর রাজ্যের প্রতিটি মানুষের নিরাপত্তা বিধান তাঁর নৈতিক দায়িত্ব।

শাসক হিসেবে ওমর কেমন ন্যায়পরায়ণ ছিলেন, ন্যায়ের ও বিচারের প্রশ্নে কেমন আপোষহীন ছিলেন তাঁর জীবনের একটি ঘটনা উল্লেখে তা উন্মোচন করেছেন কবি। মদ্যপানের অপরাধে তিনি তাঁর প্রিয়পুত্র আবু শামাকে দোর্রা মেরে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন। এ ব্যাপারে সামান্য করুণাও তাঁর চিত্ত বিগলিত করেনি,

এত যে কোমল প্রাণ,
করুণার বশে তবু গো ন্যায়ের করনি ক অপমান
মদ্যপানের অপরাধে প্রিয় পুত্রের নিজ করে
মেরেছ দোর্রা, মরেছে পুত্র তোমার চোখের 'পরে।

সাধারণ মানুষের বন্ধু রূপে হযরত ওমর ফারুক [রাঃ] রাজ্যশাসন করেছেন। ন্যায়নীতি, দায়িত্বশীলতা, দয়া, করুণা ও সাম্য চেতনার মূর্ত প্রতীক ছিলেন তিনি। নজরুল তাঁকে ধর্মপীর বা ধর্মনেতা রূপে নয় – একজন মানবদরদী আদর্শ শাসক ও বীর নেতা হিসেবে দেখেছেন। নজরুল তাঁর সমসাময়িক কালে অধঃপতিত মুসলিম বিশ্বে তাঁর মতো শাসকের প্রয়োজন অনুভব করেছেন। তাই তিনি কবিতার শুরুতে তাঁর আবির্ভাব কামনা করেছেন,

ফিরদৌস ছাড়ি' নেমে এস তুমি সেই শমসের ধরি',
আর একবার লোহিত-সাগরে লালে লাল হয়ে মরি।

ইসলামের রক্ষক বা খাদেম নয় – একজন মানবদরদী শাসক বলেই তিনি তাঁকে স্মরণ করেছেন,

মানুষেরে তুমি বলেছ বন্ধু, বলিয়াছ ভাই, তাই,

তোমারে এমন চোখের পানিতে স্মরি গো সর্বদাই।

অতএব, বলা যায় ধর্মবোধ উৎসারিত চেতনা নয়—মানবতাবোধ উৎসারিত চেতনাই 'উমর ফারুক' কবিতার কেন্দ্রীয় প্রেরণা।

বাঙলার 'আজিজ'

অবদুল আজিজ (১৮৬৩-১৯২৬) ছিলেন নোয়াখালি অঞ্চলের প্রথম দিককার অন্যতম বাঙালি মুসলমান গ্র্যাজুয়েট। চট্টগ্রাম মাদ্রাসার ইংরেজির শিক্ষক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় (১৯৮৮)। ১৯০৬ সালে (অক্টোবর) ঢাকায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন তিনি। ঐ সম্মেলনে 'মুসলিম লীগ গঠিত হলেও তিনি রাজনীতি থেকে বরাবর দূরেই ছিলেন। তিনি বরং পশ্চাৎপদ বাঙালি মুসলমান সমাজে শিক্ষার আলো বিস্তারের চেষ্টা করেন। ১৯১৫ সালে তিনি চট্টগ্রাম বিভাগীয় স্কুল-ইনসপেক্টর পদে উন্নীত হন। এর ফলে নোয়াখালি-চট্টগ্রাম অঞ্চলে নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও উন্নয়নে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হন। নোয়াখালি আহমদীয়া মাদ্রাসা, ফেনি কলেজ [বর্তমান ফেনি সরকারি কলেজ] ও মুন্সিরহাট হাইস্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর জীবনের প্রধান কীর্তি হলো 'চট্টগ্রাম মুসলিম শিক্ষা সমিতি' (আবদুর রহমান খাঁ, ১৯৬৪ : ১১০)। এ সমিতির সহযোগ তিনি ভিক্টোরিয়া ইসলাম হোস্টেল, কবিরুদ্দীন মেমোরিয়াল হল ও ইসলামিয়া রিডিং রুম স্থাপন করেন। কর্মজীবনের ফাঁকে ফাঁকে তিনি সাহিত্য চর্চাও করতেন। 'ওবেদী বিয়োগ' ও 'কবিতা কলিকা' নামে তাঁর দুটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

অবসর গ্রহণের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠন কাজে (১৯২১-২৩) তিনি স্পেশাল অফিসার স্টেপলটন সাহেবের সেক্রেটারি নিযুক্ত হন (ঐ, ১১০)।

ঢাকায় এসে তিনি চট্টগ্রাম মুসিলম শিক্ষা সমিতির অনুসরণে একটি শিক্ষা সমিতি গঠন করেন - যার সভাপতি হন ঢাকা বিভাগের ইনসপেক্টর গ্রিফিথ। অনেক বছর ধরে গরিব মুসলিম ছাত্ররা এ সমিতি থেকে বিভিন্ন সাহায্য পেয়েছিল (ঐ, ১১১)। এভাবে তিনি যেখানে গেছেন সেখানেই শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করেছেন। তাঁর একমাত্র কন্যা আছিয়া খাতুনের ছেলে ও মেয়ে হলো মুহাম্মদ হবীবুল্লাহ বাহার (১৯০৬-৬৬) ও শামসুন নাহারকে শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করেন তিনি। তিনি তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনে সঞ্চিত

অর্থ [তৎকালীন মূল্য দু' লক্ষ টাকা] ও চট্টগ্রামস্থ বিরাট ভূসম্পত্তি শিক্ষা বিস্তারের জন্যে দান করে যান (জমির আহমদ, ১৯৯০ : ২২১)।

দেশে এভাবে শিক্ষাবিস্তার ও সমাজসেবায় তাঁর অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'খান বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করে (১৯২৪)। এর দু' বছর পর, (৯ মে, ১৯২৬), তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

হবীবুল্লাহ বাহার ১৯২৫ সালে কলকাতায় নজরুলের সংগে পরিচিত হন। সেই সূত্রে তিনি প্রথম (জুন, ১৯২৬) চট্টগ্রাম গেলে হবীবুল্লাহ বাহারের আমন্ত্রণে মাতামহ আবদুল আজিজের তামাকুমণ্ডিস্থ বাস ভবনে [আজিজ মঞ্জিল] কিছু দিন থাকেন। বাহার-নাহারের বিধবা মা আছিয়া খাতুন তাঁর দেখাশুনা করতেন। (মাহমুদ নুরুল হুদা, ১৯৮৮ : ১৭)। এখানে অবস্থানকালে তিনি সদ্য প্রয়াত খান বাহাদুর আবদুল আজিজ স্মরণে 'বাংলার আজিজ' কবিতাটি রচনা করেন (জুলাই)। পরে ১৯২৭ সালে মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় (অক্টোবর-নভেম্বর) এটি প্রথম প্রকাশিত হয় (রফিকুল ইসলাম, ১৯৬৯ : ৪৭)।

তৎকালীন বাংলাদেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের এক বৃহৎ অংশ অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলো। যারা কিছু লেখাপড়া করেছে তারাও আবার নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিলো। মুসলমান সম্প্রদায়ের সেই তমঃঘন পরিবেশে আবদুল আজিজ 'মশাল বাহী বিশাল পুরুষ' রূপে আবির্ভূত হন। মুয়াজ্জিনের মতো সবার আগে তিনি বাংলাদেশের মুসলমানদের জাগার আহ্বান জানালেন। সে সময়কার বাংলাদেশের মুসলমান সমাজের বাস্তবচিত্র ও তারই প্রেক্ষাপটে আজিজের ভূমিকা ব্যক্ত করেছেন কবি,

পোহায়নি রাত, আজান তখনো দেয়নি মুয়াজ্জিন,
মুসলমানের রাত্রি তখন আর সকলের দিন।
অঘোর ঘুমে ঘুমায় যখন বঙ্গ মুসলমান
সবার আগে জাগলে তুমি গাইলে জাগার গান।

এর ফলে,

আঁধার রাতের যাত্রী যত উঠল গেয়ে গান,
তোমার চোখে দেখল তারা আলোর অভিযান।

বেরিয়ে এল বিবর হতে সিংহ শাবক দল
যাদের প্রতাপ-দাপে আজি বাঙলা টলমল।

এখানে কবি বলতে চেয়েছেন, আবদুল আজিজের শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াস সার্থক হয়েছে। এ কারণে শিক্ষিত ও জাগরিত মুসলমানদের পদভারে বাংলাদেশ স্পন্দিত। বাহার-নাহার এঁদেরই প্রতিনিধি। সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিক্ষা, এমন কি রাজনীতির ক্ষেত্রেও তাঁরা পালন করছেন ঐতিহাসিক ভূমিকা।

শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা ছাড়াও আবদুল আজিজের চারিত্রিক গুণ ও দৃষ্টিভঙ্গিটি বাংলাদেশকে আলোকিত করেছে। তিনি ছিলেন তথাকথিত পর্দাপ্রথার বিরোধী ও নর-নারী বৈষম্য বিরোধী। এখানে স্মর্তব্য, ছাত্রাবস্থায় (১৮৮০-৮৬) তিনি ঢাকায় 'সুহৃদ সম্মিলনী' গঠন করেন যা নারীশিক্ষা বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এ কবিতায় কবি তাঁকে যথার্থভাবেই 'দুশমন পর্দার' ও 'সাম্যবাদী' বলে আখ্যাত করেছেন,

এলে নিশান-বরদার বীর, দুশমন পর্দার,
লায়লা চিরে আনলে নাহার, রাতের তারা-হার।
সাম্যবাদী ! নর-নারীরে করতে অভেদ জ্ঞান,
বন্দিনীদের গোরস্তানে রচলে গুলিস্তান।

তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা - প্রতিষ্ঠানে শুধু মুসলমানরাই লেখাড়া করেনি, করেছে হিন্দুরাও। একইভাবে, তাঁর সমাজ সংস্কার-কর্মের দ্বারা হিন্দু - মুসলমান সবাই উপকৃত হয়েছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের তুলনায় মুসলমান সম্প্রদায় ছিলো অধিকতর অনগ্রসর ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। তাই তিনি বিশেষভাবে বাংলাদেশের মুসলমান সমাজে আধুনিক শিক্ষার প্রসারে ব্রতী হন। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের প্রতি ছিলো তাঁর সমান দৃষ্টি ও সহানুভূতি। তাই উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই তিনি সমান শ্রদ্ধেয় ও সমান প্রিয় ছিলেন,

ফুরিয়েছে কাজ, ডাকছে তবু হিন্দু-মুসলমান,
সবার "আজিজ" সবার প্রিয়, আবার গাহ গান।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে কবির প্রার্থনা,

আবার এসো সবার মাঝে শক্তিরূপে বীর,
হিন্দু সবার গুরু ওগো, মুসলমানের পীর।

নজরুলের মতে আবদুল আজিজ শুধু হিন্দুর নন, শুধু মুসলমানেরও নন, তিনি বাংলার বাঙালির, তাঁর অবদানে বাংলাদেশ আলোকিত হয়েছে।

পরে ১৯২৯ সালে, নজরুল চট্টগ্রাম মুসলিম এডুকেশন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অভিভাষণে আবদলু আজিজের ওপর দীর্ঘ বক্তৃতা করেন (নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, ১৯৯৩ : ১০২)।

শরৎচন্দ্র

জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) সাহিত্য, সমাজ ও রাজনীতি-চিন্তায় প্রগতিশীলতার অনুবর্তী ছিলেন। কোনো কোনো সময় তিনি বিপ্লবী চিন্তাধারার পরিচয়ও দিয়েছেন। রাজনৈতিক সংগঠন ও কর্মকাণ্ডেও তিনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি ১৯২১ সালে কংগ্রেসে যোগ দেন (গোপালচন্দ্র রায়, ১৯৬৬ : ৩৭৫)। সাহিত্য ও রাজনীতি সূত্রে নজরুলের সংগে তাঁর পরিচয় ছিলো। কংগ্রেসের অহিংস আন্দোলনে বিশ্বাসী থাকলেও তিনি তখনকার সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দলের সংগেও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতেন। এমনকি, অর্থ সাহায্যও দিতেন। তাঁর মাতুল সম্পর্কীয় আত্মীয় বিপ্লবী বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ও অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সহ কয়েকজন মিলে হুগলির উত্তর পাড়ায় 'কর্মী সংঘ' নামে এক বিপ্লবী গুপ্ত দল গঠন করেন। ঐ কর্মী সংঘের এক সভায় অমরনাথ শরৎচন্দ্রকে নিয়ে যান। তাঁর সংগে সেদিন নজরুলও যান এবং কয়েকটি দেশাত্মবোধক গান গান (ঐ, ৩৯৭)। কলকাতার গজেনদার আড্ডায় শরৎচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল প্রমুখ সাহিত্যিক যেতেন (রফিকুল ইসলাম, ১৯৯১ : ৪০)। সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর (২৫ জুন) পর কলেজ স্কোয়ারের স্টুডেন্টস হলে শরৎচন্দ্রের সভাপতিত্বে আনুষ্ঠিত শোকসভার জন্যে নজরুল রচনা করেন 'সত্যেন্দ্র-প্রয়াণ গীতি' [চল চঞ্চল বাণীর দুলাল']। সভার কার্যসূচি অনুযায়ী তিনি তা গেয়ে সভার উদ্বোধন করেন (গোপালচন্দ্র রায়, ৩৫৭)। নজরুল 'ধূমকেতু' প্রকাশ করলে শরৎচন্দ্র নজরুলকে 'পরম কল্যাণীয়বরেষু' সম্বোধন করে এক শভেচ্ছা বাণী[৬] প্রেরণ করেন। এ ছাড়া ধূমকেতুর মহররম সংখ্যায়(সপ্তম

---

৬. পরম কল্যাণীয়বরেষু,
তোমার কাগজের দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া একটি মাত্র আশীর্বাদ করি, যেন শত্রুমিত্র নির্বিশেষে নির্ভয়ে সত্য কথা বলিতে পার। তার পরে ভগবান তোমার কাগজের ভার আপনি বহন করিবেন।

তোমাদের
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সংখ্যা, ২রা সেপ্টেম্বর ১৯২২) শরৎচন্দ্রের 'আমার কথা' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় (১৯২২ : ১৫–১৬১)।

হুগলি জেলে নজরুল অনশন করলে শরৎচন্দ্র বিচলিত হয়ে পড়েন। ১৭ মে হাওড়া জেলার বাজে শিবপুর হতে কানপুরের লেখিকা লীলারাণী গংগোপাধ্যায়কে লিখিত তাঁর এক পত্রে এ বিচলিত চিত্ততার প্রমাণ মেলে। তিনি তাঁর সংগে জেলে দেখা করতে গেলেও দেখা করতে পারেননি (রফিকুল ইসলাম, ১৯৯১ : ৯৯)।

শরৎচন্দ্রের বায়ান্নতম জন্মতিথি (১৯২৭) উপলক্ষে নজরুল 'শরৎচন্দ্র' শীর্ষক কবিতাটি রচনা করেন। সে সময় এটি 'নওরোজ' (১৯২৭) পত্রিকার প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয় (রফিকুল ইসলাম, ১৯৬৯ : ৪৬)।

এ কবিতায় কবি শরৎচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পাশাপাশি বাঙালি সমাজে তাঁর অবদান ও তাঁর দৃষ্টিভংগি তুলে ধরেছেন। কবি তাঁকে 'নব ঋত্বিক নবযুগের', 'রাতের উদীচি ঊষা,' 'নরলোকের নারায়ণ' ও 'মানুষের কবি' বলে অভিহিত করেছেন।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মাটি – মানুষের কাছাকাছি থেকে তাদের নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন। তিনি বিভিন্ন কুসংস্কার ও বিধি–নিষেধের শৃঙ্খলে নির্যাতিত মানুষের বেদনা উপলব্ধি করেছেন এবং সে বেদনা ভাষায় রূপ দিয়েছেন। এজন্যে কবি তাঁকে 'বেদনা–সুন্দরের দরদ–ই–দিল' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর পূর্বসুরিরা উচ্চ শ্রেণীর জীবন ও স্বপ্ন এবং প্রকৃতিলোকে তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন। তিনি তাঁদের সে পথ অনুসরণ করেননি। তিনি সমাজে অবহেলিত এবং অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের দুঃখ–বেদনার সকরুণ ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন। ফলে দেশে জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে। শরৎচন্দ্রের এই অবদান উল্লেখ বাঙ্ময় কবিকণ্ঠ,

নিঙাড়িয়া ধুলা মাটির রস
পিইলে শিব নীল আসব
দুঃখ কাঁটায় ক্ষত হিয়ার
তুমি তাপস শোনাও স্তব।
স্বর্গভ্রষ্ট প্রাণধারায়
তব জটায় দিলে গো ঠাই,

মৃত সাগরের এই সে দেশ
পেয়েছে প্রাণ আজিকে তাই।

প্রচলিত সামাজিক মূল্য চেতনার উর্ধ্বে ছিলো তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি। তাই তিনি উচ্চ-তুচ্ছ নির্বিশেষে সকল মানুষকে সমান মর্যাদা দিয়েছেন। মানবতার জয়গানে উচ্চকিত ছিলেন তিনি,

পায়ে দলি' পাপ-সংস্কার
খুলিলে বীর স্বর্গ দ্বার,
শুনাইলে বাণী, "নহে মানব -
গাহি গো গান মানবতার।"

তাঁর এ উদারনৈতিক ও মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে শাস্ত্রপন্থী, আভিজাত্যগর্বী ও নীতি-বাগীশরা তাঁর নিন্দা-সমালোচনায় ছিলো উচ্চকণ্ঠ। কিন্তু এতে তিনি খুব বেশি বিচলিত হননি। তাঁর এ জন্মবার্ষিকীতে আজ তাঁরাও তাঁকে শুভেচ্ছা জানাতে এসেছেন। কবি একে তাঁর 'শ্রেষ্ঠ জয়' বলে আখ্যাত করেছেন।

মানুষ তাঁকে ভুল বুঝলেও তিনি মানুষের প্রতি বিমুখ হননি। কাঁটার আঘাত সয়ে তিনি ফুল ফুটিয়ে গেছেন মানুষের জন্যেই। তাঁর সাহিত্যে তিনি চার পাশের বাস্তব মানুষের জীবন ও জীবনাকাঙ্ক্ষাই রূপায়িত করেছেন। এজন্যে তিনি চিরদিন মানুষের মাঝে বেঁচে থাকবেন ; যুগে যুগে মানুষেরা গাইবে তাঁর জয়গান,

মানুষের কবি ! যদি মাটির
এই মানুষ বাঁচিয়া রয়—
রবে প্রিয় হয়ে-হৃদি-ব্যথায়
সর্বলোক গাহিবে জয়।

এ কবিতায় নজরুল সার্থকভাবে শরৎচন্দ্রের যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে পেরেছেন।

মনীন্দ্র-প্রয়াণ

মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী (১৮৬০-১৯২৯) ছিলেন কাশিমবাজারের মহারাজা। বাল্যকালেই তিনি মাতাপিতা-ভাই হারিয়ে অভিভাবকহীন হয়ে পড়েন। আত্মীয়রা তাঁকে গ্রহণে

অস্বীকৃতি জানায়। এমতাবস্থায় তিনি অসীম ধৈর্যসহকারে কঠোর জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। মাঝখানে হতাশ হয়ে একবার আত্মহত্যার চেষ্টাও করেছেন তিনি। (সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, ১৩৩৯ : ৬৬-৮২)।

অনেক পরে মনীন্দ্রের মধ্য যৌবনে কাশিমবাজারের রাণী হরসুন্দরী তাঁর এ দৌহিত্রের প্রতি সুপ্রসন্ন হয়ে কাশিমবাজারের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন এবং এক দানপত্রের (Relinquishment deed) মাধ্যমে তাঁকে সমস্ত সম্পত্তি দান করেন। (ঐ, ১১৫)। ১৮৯৮ সালের ৩০ মে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে 'মহারাজা' উপাধিতে ভূষিত হলেন।

তিনি মোট সাড়ে একত্রিশ বছর কাশিমবাজার এস্টেট পরিচালনা করেন। তিনি কর্তব্যকার্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও কর্মনিষ্ঠ ছিলেন বলে আর্থিক সমৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হন। বিশাল সম্পত্তি ও প্রচুর অর্থের মালিক হয়েও তিনি অতি সাধারণ জীবনযাপন করতেন। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন মিতব্যয়ী, অতিথিবৎসল, বন্ধুবৎসল, আশ্রিতবৎসল ও দানশীল। ১৯১১ সালে (২০ জুন) তিনি তাঁর বিলেত প্রবাসী বন্ধু হরেন্দ্র নারায়ণ মিত্রকে একপত্রে লেখেন, "আমার মনে হয় আমার যা কিছু সম্পত্তি আছে উক্ত সমস্তই পরের জন্য এবং ইহার জন্য আমি ভগবানের নিযুক্ত একজন কর্মচারী মাত্র, (ঐ, ১৯৩)। তিনি নিজের সম্পত্তি ও অর্থ পরহিতে ও সমাজকল্যাণে দান করে আনন্দ পেতেন। শিক্ষা, সাহিত্য, ধর্ম, কৃষ্টি, কৃষি, শিল্প, চিকিৎসা ও জনসেবা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাঁর অগাধ দানের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি নিজের অর্থে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং সেগুলোর ব্যয়ভারও বহন করেন। ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষার জন্যে অনেক ছাত্রকে তিনি বিদেশে প্রেরণ করেন।

তাঁর দানের পরিমাণ অপরিমেয়। তবুও মোটামুটি হিসেবে এর পরিমাণ ন্যূনাধিক তিন কোটি টাকার কম হবে না বলে সাব্যস্ত করা হয় (ঐ, ২৫৮)। তাঁর জীবনী 'সুবিস্তৃত দানের বিবরণ' বলে মনে করা যায়। জীবৎকালেই তিনি তাঁর দানশীলতা, জনহিতকর কার্যকলাপ ও সমাজসেবার জন্যে স্বীকৃতি ও উপাধি পান। পুরী বেদ স্কুল তাঁকে দানশীলতার জন্যে 'দান কল্পতরু' (১৩২৬) উপাধি দেয়।

১৯২৯ সালের ১২ নভেম্বর এই দানশীল মহারাজা মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর বিভিন্ন পত্রিকা তাঁর দানশীলতা ও চারিত্রিক গুণাবলির প্রশংসা করে নিবন্ধ প্রকাশ করে।

মনীন্দ্র নন্দীর প্রতিষ্ঠিত 'উপাসনা' পত্রিকার মনীন্দ্র-স্মৃতি সংখ্যার জন্যে নজরুল 'মনীন্দ্র-প্রয়াণে' কবিতাটি রচনা করেন। ঐ সংখ্যায় মনীন্দ্র-স্মৃতি স্মরণে অন্য কবিদের কবিতাও প্রকাশিত হয়।[৭]

নজরুল তাঁর 'মনীন্দ্র-প্রয়াণ' কবিতায় মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্রের উপর্যুক্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তবে তিনি তাঁর দানশীলতাকেই মূলত এ কবিতার মূল বিষয় হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন। তিনি তাঁকে অভিহিত করেছেন 'দানবীর' 'ইন্দ্রকান্ত' 'মনি' ও 'পুরুষ শ্রেষ্ঠ' বলে। তাঁর মনে হয়েছে, মনীন্দ্র মানুষ হয়েও দেবতা। এ জাতীয় উদার চিত্তের লোকেরা সচরাচর পৃথিবীতে জন্মান না। তাঁরা বস্তুত পৃথিবীর নন,- স্বর্গের। মানুষের আশীর্বাদরূপে স্বর্গলোকের ইঙ্গিতে তাঁরা যেন ছল করে এখানে আসেন। তাই আদর্শ, আলো ও সৌন্দর্য দান করে এবং ব্যথিতের ব্যথা দূর করে তাঁরা ফের স্বর্গেই চলে যান।

নজরুল ইসলাম লক্ষ্য করেছেন, মনীন্দ্র অঢেল অর্থ - সম্পত্তির অধিকারী হয়েও এবং বিপুল ঐশ্বর্যের মধ্যে থেকেও তিনি সরলজীবন যাপন করেছেন। উপরন্তু তিনি স্বয়ং তাঁর অর্থ - সম্পদ জনহিতে মুক্ত হস্তে দান করে গেছেন। তাঁর দানে কতো দীন-দুঃখী-ক্ষুধার্তের জীবন রক্ষা হয়েছে তাঁর কোনো হিসেব নেই। যেন তাঁর জন্মই হয়েছে সম্পদ উপার্জন করার জন্যে ও সেই উপার্জিত সম্পদ দু'হাতে বিলিয়ে দেবার জন্যে। তাঁর এ বৈশিষ্ট্যটি কবি এভাবে তুলে ধরেছেন,

ইন্দ্র, কুবের, লক্ষ্মী আশিস
ঢেলে ছিল যত শিরে,
দু'হাত ভরিয়া ক্ষুধিত মানব
দিলে তাহা ফিরে ফিরে।

এজন্যেই মনীন্দ্র পুরুষশ্রেষ্ঠ, মানবশ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠত্বের ঐশ্বর্য নিয়েই তিনি উচ্চ শিরে

---

৭. এ সংখ্যায় যেসব কবির কবিতা প্রকাশিত হয় তাঁরা হলেন শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী (মহারাজ মনীন্দ্র চন্দ্র), শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (মহামানব), শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (মহারাজ), শ্রীসৌরিন্দ্রনাথ ভট্টাচায (রাজর্ষি-প্রয়াণ), কাদের নেওয়াজ (মনীন্দ্র-বিয়োগ), শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক (যান্ত্রিক), শ্রীযতীন্দ্র প্রসাদ ভট্টাচার্য (মহাত্মা মনীন্দ্রচন্দ্র) ও শ্রীকালিদাস রায় (মহাকালের শ্রীমন্দিরে)। এ ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের কবিতার উদ্ধৃতি ও মনীন্দ্র চন্দ্রের উদ্দেশ্যে লেখা একটি হস্তলিপি ছাপানো হয়।

নির্ভয়ে পরলোকে চলে গেছেন।

যতীন দাস

যতীন্দ্রনাথ দাস (১৯০৪–২৯) বঙ্গ–ভারতের রাজনীতিতে অন্যতম প্রতিবাদী ও বিপ্লবী যুবক। প্রবেশিকা পাসের পরপরই তিনি কংগ্রেসের সদস্য হন।

এ'পর তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে দু' দু'বার স্বল্প মেয়াদের জন্যে কারাভোগ করেন ও বিপ্লবী বিনয় রায়ের সংস্পর্শে আসেন (সুধীরচন্দ্র সরকার, ১৩৭৩ : ১৮৭)।

১৯২৩ সালে বিপ্লবী শচীন সান্যাল কলকাতার ভবানীপুরে ঘাঁটি করলে তিনি এ দলে যোগ দেন । পরে দক্ষিণাঞ্চলের বিপ্লবী দলের সঙ্গেও তিনি যোগাযোগ স্থাপন করেন। ১৯২৪ সালে তিনি দক্ষিণ কলকাতায় 'তরুণ সমিতি' নামে এক বিপ্লবী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় তিনি ব্রিটিশ শাসন বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে গ্রেফতার হয়ে ঢাকা কারাগারে প্রেরিত হন। এখানে জেল কর্তৃপক্ষের আচরণের প্রতিবাদে তিনি তেইশ দিন অনশন ধর্মঘট করেন (অঞ্জলি বসু, ১৯৭৬ : ৪২৩)। এর পরও তিনি ব্রিটিশ বিরোধী কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখেন। এর ফলে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার (১৯২৮) আসামি করে। এ মামলা চলাকালে লাহোরের পুলিশ সুপার মি. স্যামজ্যামকে হত্যার (১৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৮) অভিযোগে অন্যান্য বিপ্লবীদের সংগে তাঁকেও গ্রেফতার করা হয় (রফিকুল ইসলাম, ১৯৯১ : ৪০৩)। পরে তাঁদের লাহোর কারাগারে প্রেরণ করা হয় (১৪ জুন, ১৯২৯)। সেখানে কারা কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে তিনি ও তাঁর ক'জন সহবন্দী অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। একটানা চৌষট্টি কি পঁয়ষট্টি দিন অনশনের পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন (১৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৯)।

তাঁর এ অকাল ও করুণ মৃত্যুতে কলকাতায় শোকের ছায়া নেমে আসে। সে সময়কার বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষ চন্দ্র বসু (১৮৯৭–১৯৪৫) ১৪ সেপ্টেম্বর এক বিজ্ঞপ্তি জারির মাধ্যমে পর দিন সকলকে হরতাল পালন ও তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানানোর জন্যে হাওড়া ষ্টেশনে মিলিত হতে অনুরোধ করেন।

যতীন্দ্র দাসের এই করুণ মৃত্যু উপলক্ষে নজরুল 'যতীন দাস' কবিতাটি রচনা করেন। এটি সে সময় কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। সম্ভবত কোনো পত্রিকা এটি

প্রকাশের সাহস করেনি। পরের বছর (১৯৩০) প্রকাশিত 'প্রলয়-শিখা' কাব্যে এটি অন্তর্ভুক্ত হয়। উল্লেখ্য যে, প্রকাশের পরপরই কাব্যগ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হয়। ঐ মামলার রায়ে তাঁকে ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ডাদেশও দেয়া হয়।[৮]

যতীন দাস মারা যান ভাদ্র মাসে। পরের মাসেই, অর্থাৎ আশ্বিন মাসে বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায় 'দুর্গতি নাশিনী দূর্গা'র পূজোয় মগ্ন থাকে। এ পটভূমি স্মরণ করে নজরুল 'যতীন দাস' কবিতায় বলেছেন – যে মুহূর্তে দেশের মানুষ শুধুই দেবতার পদমূলে পূজার্পণ করছে এবং এতো পূজো পেয়েও তাঁর সাড়া পাচ্ছে না – ঠিক তার আগ মুহূর্তে বীরের মতো আত্মবলিদান করলেন যতীন দাস। এ আত্মবলিদানের মাধ্যমেই যতীন বা বিপ্লবীরা (নব ভারতের পূজারী দল) দেবতাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। তাই কবি সকলের হয়ে দেবীকে জেগে উঠতে ও পূজারীদের শক্তি দেবার প্রার্থনা করেছেন।

কবি লক্ষ্য করেছেন এবং বাস্তবেও তাই ঘটেছে যে, যতীনের দেশে জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে,

কে, যতী-ইন্দ্র তরুণ তাপস
দিয়া গেলে তুমি একি এ দান?
শবে শবে গেলে প্রাণ সঞ্চারি'
কেশব, বিলায়ে তোমার প্রাণ।

যতীন দাস আত্মবলিদান করে জাতিকে জাগ্রত করেছেন, পাশাপাশি দিয়ে গেছেন মুক্তির পথ-নির্দেশনা। তাঁর এ বীরত্বব্যঞ্জক আত্মত্যাগের মহিমা কীর্তনে উন্মুখর কবি,

হাতে ছিল তব চক্র ও গদা,
গ্রহণ করনি হেলায়, বীর।
বুকে ছিল প্রাণ, তাই দিয়ে রণ

৮. কিন্তু রায়ের বিরুদ্ধে কোর্টে আপীল করায় ও পরবর্তীতে গান্ধী-আরউইন চুক্তির (১৯৩১) শর্তানুসারে তিনি কারাদণ্ড ভোগ থেকে অব্যাহতি পান।

জিনে গেলে প্রাণহীন জাতির।
তোমার হাতের শত শত দল,
শুভ্র মহাপ্রাণ তোমার,
দিয়া গেলে তব জাতিরে আশিস
তোমার হাতের নমস্কার।

যতীন দাসের স্তুতির মাধ্যমে 'সন্ত্রাসবাদী' বিপ্লবীদের প্রতি নজরুলের সহানুভূতি পুনর্ব্যক্ত হয়েছে।

কিশোর রবি

নোবেল পুরস্কারের ভূষিত (১৯১৩) কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) প্রতি কবি-জীবনের প্রথম থেকেই নজরুলের আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের একান্ত সচিব সুধাকান্ত রায় চৌধুরীর মাধ্যমে ১৯২১ সালে (অক্টোবর) শান্তি নিকেতনে নজরুল তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচিত হন।

সুধাকান্তই নজরুলের কবিতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন (রফিকুল ইসলাম (১৯৯১ : ৬৬)।

১৯২২ সালে নজরুল তাঁর 'ধূমকেতু' পত্রিকার জন্যে রবীন্দ্রনাথের শুভেচ্ছা কামনা করলে তিনি 'কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েষু' সম্বোধন করে পদ্যাকারে একটি বাণী প্রেরণ করেন। এটি 'রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী' শিরোনামে 'ধূমকেতু' পত্রিকার প্রত্যেক সংখ্যায় ছাপা হত। এর প্রথম বর্ষের অষ্টম সংখ্যায় 'বর্ষা মঙ্গল' নামে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা ছাপা হয় । প্রথম বর্ষের দ্বাদশ সংখ্যায় 'আনন্দময়ীর আগমনে' শীর্ষক স্বরচিত কবিতা প্রকাশের জন্যে নজরুলকে গ্রেফতার করা হয় এবং বিচারে এক বছর (১৬ জানুয়ারি-১৫ ডিসেম্বর) সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ দেয়া হয়।

আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে নজরুল বন্দী থাকা অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'শ্রীমান কবি কাজী নজরুল ইসলাম স্নেহভাজনেষু' সম্বোধন করে 'বসন্ত' (১৯২৩) গীতিনাট্যটি উৎসর্গ করেন এবং পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে দিয়ে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন (ফেব্রুয়ারি, ১৯২৩)। ১৪ এপ্রিল (১৯২৩) নজরুলকে হুগলি জেলে স্থানান্তর করা হয়। জেল সুপারের অত্যাচারের প্রতিবাদে তিনি ঐদিন থেকে অনশন

ধর্মঘট শুরু করেন। এতে দেশের কবি, সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। রবীন্দ্রনাথ অনশন ভাঙার অনুরোধ করে তাঁকে একটি তারবার্তা প্রেরণ করেন। অবশ্য সেটি তাঁর হাতে পৌঁছেনি। (রফিকুল ইসলাম, ১৯৯১ : ৯৪-

১৯২৫ সালে নজরুল 'লাঙল' পত্রিকার জন্যে রবীন্দ্রনাথের কাছে শুভেচ্ছা বাণী চান। তিনি চার পংক্তির একটি ছোট পদ্যাকারে শুভেচ্ছা বাণী লিখে দেন। এটি লাঙলের প্রচ্ছদে ছাপা হতো। এছাড়া লাঙলের প্রথম খণ্ডের পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যায় তাঁর কবিতা থেকে চারটি উদ্ধৃতি ছাপা হয়। ১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথের ঢাকা সফরের প্রাক্কালে ঢাকার প্রস্তুতি সম্বন্ধে লাঙলের প্রথম খণ্ডের সপ্তম সংখ্যায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্র-নজরুলের পারস্পরিক সম্পর্ক বরাবরই ছিলো সুমধুর। কিন্তু ১৯২৭ সালে (১৩ ডিসেম্বর) প্রেসিডেন্সি কলেজে রবীন্দ্র পরিষদে রবীন্দ্রনাথ নিজের এক সম্বর্ধনার উত্তরে 'খুন' শব্দটি সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য প্রদান করলে এবং সে বিষয়ে বিভিন্ন পত্রিকা বিভ্রান্তিকর রিপোর্ট প্রকাশ করলে পরস্পরের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। পরে প্রমথ চৌধুরীর (১৮৬৮-১৯৪৬) মধ্যস্থতায় তার অবসান ঘটে (রফিকুল ইসলাম ৯১৯৯১ : ১৪৫-৪৭)। এর পর ১৯২৮ সালে নজরুল তাঁর 'সঞ্চিতা' কবিতা-সংকলনটি 'বিশ্বকবি সম্রাট শ্রী শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীচরণারবিন্দেষু' সম্বোধনে উৎসর্গ করেন। ১৯৩১ সালে (২০ জুন) নজরুল 'বর্ষবাণী' (১৩৪৭) পত্রিকার সম্পাদিকা জাহানারা চৌধুরী (১৯১০-৮২) সহ দার্জিলিং-এ রবীন্দ্রনাথের সংগে সাক্ষাৎ করেন (রফিকুল ইসলাম, ১৯৯১ : ১৯১)।

এর বছর চারেক পর, ১৯৩৫ সালে নজরুল কলকাতার সাপ্তাহিক 'নাগরিক' (১৯৩৪) পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম বার্ষিক সংখ্যার জন্যে লেখা চেয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে পত্র লিখলে তিনি তাঁকে 'কল্যাণীয়েষু' সম্বোধন করে প্রতিপত্র লিখে বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার কারণে লেখা দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন (রফিকুল ইসলাম ১৯৯১ : ১৯৭-৯৮)। ঐ পত্র পেয়ে নজরুল অভিভূত হন এবং তার উত্তরে 'তীর্থ পথিক' নামে একটি কবিতা লেখেন। এতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি নজরুলের ভক্তিবাদী মনোভাবের অকৃত্রিম অভিব্যক্তি ফুটে ওঠেছে। এটিই রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নজরুলের প্রথম কবিতা। এরপর ভিন্ন ভিন্ন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তিনি আরো ছয়টি কবিতা ও একটি গান রচনা করেন : 'মৃত তারা' (১৯৩৭), 'অশ্রু পুষ্পাঞ্জলি' (১৯৪১) 'কিশোর রবি' (১৯৪১) 'রবিহারা' (১৯৪১), 'রবির জন্মতিথি' (১৯৪১) 'সালাম

অস্ত রবি' (১৯৪১) এবং 'ঘুমাইতে দাও শান্ত রবিরে'। কবিতাগুলোর মধ্যে শেষোক্ত চারটি নাম-কবিতার অন্তর্ভুক্ত।

'কিশোর রবি' কবিতায় নজরুল রবীন্দ্রনাথকে 'হে চির কিশোর কবি রবীন্দ্র' বলে সম্বোধন করেছেন। তিনি রসলোক হতে আনন্দ বেণু হাতে পৃথিবীতে এসেছেন এবং নানা আঙ্গিকে অকৃপণ হাতে রস পরিবেশন করেছেন। কিন্তু সে রস উপভোগ করার ক্ষমতা সবার নয়, একটি নির্দিষ্ট উচ্চ শ্রেণীর জন্যে তাই কবি তাঁকে এবার 'উপবাসী চির নিপীড়িত জনগণে' রস পরিবেশনের আহ্বান জানিয়েছেন,

ঊর্ধ্বের যারা তাহারা পাইল তোমার পরম দান,
নিম্নের যারা, তারে একবার কর গো পরিত্রাণ।

নজরুল বিশ্বাস করতেন রবীন্দ্রনাথ শুধু আনন্দ বিলাসের কবি নন – বিপ্লবের কবিও,

শুধু বেণু আর বীণা লয়ে তুমি আস নাই ধরা পরে
দেখেছি শঙ্খ চক্র বিষাণ বজ্র তোমার করে।

তাই কবি তাঁকে আহ্বান করেছেন তিনি যেন রুদ্র আঘাতে ঘুমন্তদের জাগিয়ে তোলেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন, রবীন্দ্রনাথ উপর শ্রেণীর জন্যে অনেক আনন্দ ও রস সৃষ্টি করেছেন। জ্ঞান বিলাসীর ঘরে তাঁর মহাশক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে নানা রূপে ও রসে। ক্ষুধাতুর মানুষেরা তাঁর রস, রূপ, দান ও আনন্দ থেকে বঞ্চিত। অথচ তাঁর রস, রূপ, দান ও সৌন্দর্যের অধিকার যে পেল, সেই হলো কিশোর। অন্তত মৃত্যুর আগে হলেও তিনি যেন উচ্চ শ্রেণীর মতো নিম্ন শ্রেণীকেও তাঁর সৃষ্টি ভোগ করার সুযোগ করে দিয়ে যান। কারণ, জাগরণ-আকাঙ্ক্ষী নজরুল মনে করেন, রবীন্দ্রনাথের বিপ্লবী বাণী-মন্ত্রে দেশে জাগরণ সৃষ্টি হবে। তাই রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর আকুল প্রার্থনা,

ওগো ও পরম রুদ্র কিশোর। তোমার যাবার আগে
নির্জিত নিদ্রিত এ ভারত যেন গো বহ্নিরাগে
রঞ্জিত হয়ে ওঠে। অসুন্দরের ভীতি চলে যায়।....
রবি, তোমার নারায়ণ রূপে এ ভারত পূজা করে,
যাইবার আগে, জাগাইয়া তুমি যাও সেই রূপ ধরে।

রবিহারা

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর দিনই (৭ আগস্ট ১৯৪২) শোকাহত চিত্তে নজরুল রচনা করেন 'রবিহারা' শীর্ষক কবিতাটি। এটি তিনি ঐ দিনই কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে আবৃত্তি করেন। পরে এটি ১৯৪১ সালের আগস্ট–সেপ্টেম্বর সংখ্যায় 'সওগাত' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় (রফিকুল ইসলাম ১৯৬৯ : ১৩১)। বঙ্গাব্দ সালের হিসেবে ২২শে শ্রাবণ (১৩৪৭) রবীন্দ্রনাথ প্রয়াত হন। তাই নজরুলের কবি–কল্পনায় তাঁর জন্যে শ্রাবণের বেদনাও ধরা পড়েছে।

দুপুরের রবি পড়িয়াছে ঢলে অস্ত পথের কোলে
শ্রাবণের মেঘ ছুটে এল দলে দলে
উদাস গগণতলে,
বিশ্বের রবি, আমাদের কবি,
শ্যাম বাংলার হৃদয়ের ছবি
তুমি চলে যাবে বলে।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বাংলার আকাশে দীপ্যমান সুর্যসম। বাংলা ও বাঙালিকে আঁধারে ফেলে তিনি পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন। ফলে বাঙালিরা অসহায় হয়ে পড়ল। এ অবস্থায় বাংলাদেশের মানুষ ও প্রকৃতি বিলাপ করছে এবং সংগে সংগে তাঁকে তাদের মধ্যে ফিরে আসার মিনতি করছে,

হের, অরণ্য কুন্তল এলাইয়া বাঙলা যে কাঁদে,
কৃষ্ণ তিথির অঞ্চলে মুখ লুকায়েছে আজ চাঁদে।
শ্রাবণ মেঘের আড়াল টানিয়া গগণে কাঁদিছে রবি,
ঘরে ঘরে কাঁদে নরনারী, "ফিরে এস আমাদের কবি।"

তিনি বাংলার এতো আত্মীয় ছিলেন যে তা তাঁর মৃত্যুর পরে বোঝা গেছে। 'বিশ্বকবি' হয়েও তিনি ছিলেন একান্ত 'বাংলার কবি'– 'বাঙালির কবি'। তাঁকে হারিয়ে বাঙালি যে কী হারিয়েছে তা বাঙালি ছাড়া অন্য কারো পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়,

বাঙ্‌লার রবি নিভে গেল আজ, আর কাহারও নয়।

বাঙালি ছাড়া কি হারালো বাঙালি কেহ বুঝিবে না আর,
বাঙ্‌লা ছাড়া এ পৃথিবীতে এত উঠিবে না হাহাকার।
মোদের আশার রবি চলে গেলে নিরাশা আঁধারে ফেলে,
বাঙ্‌লার বুকে নিত্য তোমার শ্মশানের চিতা জ্বলে।

কবিগুরুকে হারিয়ে বাঙালিরা কোথাও সান্ত্বনা পাচ্ছে না ; তারা তাঁকে শ্রীভগবানের আশীর্বাদ ভেবেছিলো। তবে তিনি যে লোকেই থাকেন যেন এ হতভাগ্য জাতিকে মনে রাখেন, এ কামনার মধ্য দিয়ে কবি তাঁর দীর্ঘ শোকগাঁথা শেষ করেছেন।

রবির জন্মতিথি

মৃতু-পরবর্তী প্রথম রবীন্দ্র জন্মদিনে (২৫ বৈশাখ, ১৩৪৮) নজরুল 'রবির জন্মতিথি' রচনা করেন।

রবীন্দ্র কাব্যবাণী মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বৃহত্তর জনগোষ্ঠী অশিক্ষিত বলে তারা তার মর্ম ও রসাস্বাদন থেকে বঞ্চিত। তাই তাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ অজ্ঞাত। এই প্রেক্ষাপটে এ কবিতায় কবি সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন তুলেছেন, 'রবির জন্মতিথি কয়জন জানে?' নজরুল লিখেছেন—যেদিন বাংলাদেশের মানুষ শিক্ষিত হয়ে উঠবে সেদিনই রবীন্দ্রনাথ তুল্য মূল্য পাবেন, সেদিনই তাঁর জন্মতিথি পালন সার্থক হবে,

কবি হয়ে এল রবি এই বাঙ্‌লায়
দেখিল বুঝিল বলো কত জন তাঁয়?
রবি দেখে পেয়েছে যে আলোক প্রথম
তারি মাঝে লভে রবি প্রথম জনম।
নিরক্ষর ও নিস্তেজ বাঙ্‌লায়—
অক্ষর জ্ঞান যদি সকলেই পায়,
অক্ষয় অব্যয় রবি সেই দিন
সহস্র করে বাজাবেন তাঁর বীণ।

এ কবিতায় নজরুল একটি মৌলিক প্রশ্নই উত্থাপন করেছেন। দেশের মানুষকে অশিক্ষিত রেখে মুক্তির বাণীর যতোই শিল্পরূপ দেয়া হোক কিংবা যতোই স্মরণোৎসব বা জন্ম-জয়ন্তীর আয়োজন করা হোক, তা সফল হবে না। সুতরাং সবার আগে মানুষকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে - এই হলো নজরুলের দাবি।

সালাম অস্ত-রবি

'সালাম অস্ত-রবি' কবিতায় রবীন্দ্র-মাহাত্ম্য গাঢ় বর্ণে ফুটে ওঠেছে। এখানে তিনি রবীন্দ্রনাথকে 'কাব্যগীতির শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, দ্রষ্টা, ঋষি, ধ্যানী ও মহাকবি' বলে আখ্যাত করেছেন। এমন মহাকবির মৃত্যুতে সর্বত্র বিপদ নেমে এসেছে,

বীণা, বেণুকা ও বাণী
নীরব হইল। ধুলির ধরণী জানি সে কত দিন
রস-যমুনায় পরশ পাবে না। প্রকৃতি বাণী হীন
মৌন বিষাদে কাঁদিবে ভুবনে, ভবনে ও বনে একা,

নজরুল রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভার প্রশস্তি গেয়েছেন এই বলে যে, বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন কালের শ্রেষ্ঠ কবির সমন্বিত রূপমূর্তি রবীন্দ্রনাথ। সকল দেশের ও সকল কালের মেধা একত্র করে ঈশ্বর রবীন্দ্রনাথকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তাঁর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের শৈল্পিক সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটেছে।

ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, খৈয়াম, হাফিজ ও রুমী,
আরবের ইমরুল কায়েস সে ছিলে এক সাথে তুমি।
সকল দেশের সকল কালের সকল কবিরে ভাঙ্গি'
তাঁহাদের রূপে রসে রাঙাইয়া বুঝি কত যুগ জাগি'
তোমারে রচিল রসিক বিধাতা অপরূপ সে বিলাস
তব রূপে গুণে ছিল যে পরম সুন্দরের আভাস।

কবি তাঁর স্তুতি করে বলেছেন, রবীন্দ্রনাথকে পেয়ে ভারতবাসী তাদের পরাধীনতা, পীড়ন ও দুঃখ-দৈন্য যেন ভুলে গিয়েছিলো। তিনি বিভিন্ন দেশের অর্ঘ্য এনে দিয়ে তাঁর জাতিকে ধন্য করেছেন। তিনি সবাইকে ভালোবেসেছিলেন, সবার জন্যেই রস

পরিবেশন করেছিলেন। প্রকৃতির মতো তিনি ছিলেন সবার। কবি তাঁর সেই উদার নৈতিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেন এভাবে—

ফুলের, পাখির, চাঁদ সুরুযের নাহিক যেমন জাতি,
সকলে তাদেরেভালো বাসে, ছিল তেমনি তোমার খ্যাতি।
রসলোক হতে রস দেয় যারা সৃষ্টি ধারার প্রায়
তাদের নাহিক' ধর্ম ও জাতি, সকলের ঘরে যায়।
অবারিত দ্বার রস-শিল্পীর, হেরেমেও অনায়াসে
যায় তার সুর কবিতা ও ছবি আনন্দ অবকাশে।

তিনি জীবন নিঙাড়ি ভালোবেসেছেন মানুষকে, তাদের শক্তি, সাহস ও আনন্দ দিয়েছেন। তাই তাঁকে হারিয়ে মানুষ কাঁদছে, কাঁদছেন স্রষ্টাও যেন। রবীন্দ্রনাথের ভাব - শিষ্য না হয়েও নজরুল রবীন্দ্র-প্রতিভা ও সাহিত্যের প্রতি বরাবরই ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। তাঁর মৃত্যু তাঁকে গভীর শোকে নিমজ্জিত করেছে। মৃত্যু-পরবর্তী কবিতাগুলো শোকাতুর কবি-হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি।

মহাত্মা মোহসিন

মুহম্মদ মোহসিন (১৭৩২-১৮১২) বঙ্গ-ভারতে দানশীল মহাপুরুষ রূপে কিংবদন্তির খ্যাতি অর্জন করেছেন। শৈশবে মাতৃপিতৃহীন হয়ে তিনি বড় বোন মুন্নুজানের (১৭২২-১৮০৩) প্রযত্নে পালিত হন। ত্রিশ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করে ফকিরের বেশে ভারত উপমহাদেশে, পারস্য, আরব, মিশর, তুরস্ক সফর করেন। এ সময় ভগ্নিপতির মৃত্যু হলে (১৭৫৪) দেশে ফিরে বোনের অনুরোধে তাঁর বিরাট সম্পত্তির দেখাশুনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নিঃসন্তান মন্নুজান মৃত্যুর পূর্বে তাঁর সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি মোহসিনকে দিয়েছেন (১৮০৩)। চিরকুমার মোহসিন মৃত্যুর ছয় বছর-পূর্বে দানপত্রের মাধ্যমে সেই সম্পত্তি জনস্বার্থে ওয়াক্‌ফ করে দেন। এই ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি তত্ত্বাবধানের জন্যে তিনি দু'জন মোতাওয়ল্লি[৯] নিযুক্ত করেন। তাঁর দেয় অর্থে হুগলির ইমামবাড়া

৯. তিনি তাঁর বন্ধু রজব আলী খাঁ ও সাকীর আলী খাঁকে মতোয়াল্লী নিযুক্ত করে যান। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁরা ও তাঁদের উত্তরসূরিরা সে সম্পত্তি গ্রাস করতে শুরু করে। পরে সরকার নিযুক্ত কর্মকর্তার মাধ্যমে সে সম্পত্তি দেখাশুনা করা হয়।

(১৯১৭) সংস্কার করা হয়। তাঁর দানের বিরাট অংকের টাকা থেকে দু'লক্ষ টাকা দিয়ে 'মোহসিন শিক্ষা ফাণ্ড' গঠন করা হয়। এই ফাণ্ডের অর্থে হুগলি, ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর ও রাজশাহীতে মাদ্রাসা ও তৎসংলগ্ন ছাত্রাবাস স্থাপন করা হয়। পরবর্তীকালে কোনো কোনো মাদ্রাসা কলেজে রূপান্তরিত হয়। তাছাড়া বিভিন্ন কলেজে অধ্যায়নরত মুসলিম ছাত্রদের বেতনের দুই–তৃতীয়াংশ উক্ত তহবিল হতে দেবার ব্যবস্থা করা হয়। (আহমদ আলী মুন্সী, ১৯৬৯ : ১৩৭)। অবশ্য, এক সময় এ তহবিল হতে অমুসলিম ছাত্ররাও বৃত্তি পেতো। হুগলি কলেজও মোহসিনের অর্থে স্থাপিত হয় (১৮৩৬)।

নজরুল হুগলি থাকাকালে (১৯২৫) মোহসিন সম্পর্কে সম্যক অবহিত হয়ে থাকবেন.। সে সময় তিনি হুগলির প্রধান দর্শনীয় স্থান ইমামবাড়া [মোহসিনের অর্থে যার সংস্কার সাধিত হয়েছিল] ও মোহসিন–প্রতিষ্ঠিত ইমামবাড়া বাজারে প্রায় যেতেন বলে জানা যায় (সুধীর কুমার মৈত্র, ১৯৯২ : ৬০)।

১৯৪১ সালের ২৯ নভেম্বর মোহসিনের ১২৯ তম মৃত্যুবার্ষিক উপলক্ষে নিখিল বঙ্গ মুসিলম ছাত্রলীগের উদ্যোগে কলকাতার কলেজ স্ট্রিটস্থ ওভারটন হলে এক স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়। সে সময় নজরুল সম্পাদিত 'নবযুগে' (১৯৪১) [নব পর্যায়] ২৮ ও ২৯ নভেম্বর উক্ত স্মরণ সভার দুটি বিজ্ঞাপন[১০] ছাপা হয়। এসব

---

১০. [ক] 'মোহসিন দিবস' উপলক্ষে কবি নজরুল ইসলাম একটি গান রচনা করিয়াছেন এবং সভায় কবির সাগরেদগণ এই গান গাহিবেন। তাছাড়া 'মর্সিয়া'ও হইবে।
জনসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

নূরুল হুদা, কনভেনর'

[খ] মোহসনি স্মৃতি দিবস

১২৯তম মৃত্যু বার্ষিকী অনুষ্ঠান

নিখিলবঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের উদ্যোগে বিরাট সভার আয়োজন

তারিখ ও সময় ঃ অদ্য ২৯শে নভেম্বর, শনিবার, সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকা, স্থান : 'ওভারটন হল', ৮৬ নং কলেজ স্ট্রীট (ওয়াই, এম, সি, এ, কলেজ স্ট্রীট)

উদ্বোধন করিবেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, সভানেত্রী : মিসেস হাসিনা মোরশেদ ও, বি, ই,, এম, এল, এ

গান রচনা করিয়াছেন : কাজী নজরুল ইসলাম

গান করিবেন : আব্বাসউদ্দীন আহমদ

বক্তা : ডা. কালিদাস নাগ, প্রফেসর বেগম শামসুন নাহার মাহমুদ, খান বাহাদুর আফজাল, এম, এল, এ, মি. সৈয়দ বদরুদ্দোজা এম. এ. বি. এল, এম. এল. এ. কবি মোজাম্মেল হক এম. এল. এ. অধ্যাপক কাজী আবদুল ওয়াদুদ [ওদুদ] এম. এ. এবং আরো অনেকে।

বিজ্ঞাপনে দেখা যায়, নজরুল ছিলেন অনুষ্ঠানের উদ্বোধক। উক্ত অনুষ্ঠান উপলক্ষে তিনি 'মহাত্মা মোহসিন' নামে একটি গান রচনা করেন। মোহসিন স্মৃতিবার্ষিকী উদ্‌যাপনের পরের দিন ৩০ নভেম্বর স্মৃতিবার্ষিকী অনুষ্ঠানের বিস্তারিত প্রতিবেদন নবযুগে প্রকাশিত হয় (শেখ দরবার আলম ১৯৯৮: ৫১০)। তা থেকে জানা যায়, নজরুল সর্বপ্রথমে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করে তাঁর লিখিত ও সেদিন [৩০ নেভেম্বর] নবযুগে প্রকাশিত 'মহাত্মা মোহসিন' নামক কবিতাটি আবৃত্তি করেন।

এ কবিতায় কবি মুহম্দ মোহসিনেক 'মহাত্মা', 'মানবাত্মার নিত্যবন্ধু' ও 'দ্রষ্টা' বলে সম্বোধন করেছেন। কবির মতে, মোহসিন তাঁর চারিত্রিক ঔদার্য ও মহত্বের জন্যে শুধু ইতিহাসে নয়, মানব-হৃদয়েও চির অম্লান থাকবেন। মানুষ তাঁকে আত্মীয়জ্ঞানে যুগ যুগ ধরে স্মরণ করবে।

ভোগৈশ্বর্যে মত্ত মানুষরূপী পশুদের তিনি পথ দেখিয়েছিলেন নিজের সর্বস্ব পরহিতে দানের মাধ্যমে। নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে তিনি মানবসেবায় নিজেকে সমর্পিত করলেন ; তাঁর এ আত্মত্যাগের পরিচয় আবেগ সঞ্চারী ভাষায় বর্ণনা করেছেন কবি,

পথভ্রষ্ট সেই মানুষেরে তুমি পথ দেখাইলে,
রাজৈশ্বর্য বিলায়ে ভিক্ষু, ভিক্ষা-পাত্র নিলে।
ভিক্ষা-পাত্র প্রেম-অমৃত পূর্ণ করিয়া তুমি
সিক্ত করিলে আত্মার কাবা, দারিদ্র্য-মরুভূমি।

প্রতিদানের কোনো প্রত্যাশা না করেই তিনি অকাতরে মনের আনন্দে দান করেছেন তাঁর অর্থ-সম্পদ। কবি তাঁর নিঃস্বার্থ দানের কথা স্পষ্ট করার জন্যে উপমাযোগে বলেছেন ঃ মেঘ যেমন প্রতিদানের আশা না করেই বৃষ্টি হয়ে ঝরে যায়, প্রদীপ যেমন নিজেকে পুড়িয়ে অন্যকে আলো দান করে, ঠিক তেমনি তিনিও আত্মদান করে গেছেন।

প্রধানমন্ত্রী মাননীয় মি. এ. কে. ফজলুল হক সাহেব সভায় উপস্থিত থাকিয়া বক্তৃতা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

নূরুল হুদা
সম্পাদক
নিখিলবঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগ
(শেখ দরবার আলম, ১৯৮৮ : ৯)

তাঁর দানের ফলাফল কী ,তাও কবির দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি লক্ষ্য করেছেন, তাঁর দানে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও বৃত্তি - তহবিল থেকে অনেক ছেলে-মেয়ে শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৩), ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-৯৪), দিলওয়ার হোসেন খান বাহাদুর, সাখাওয়াত হোসেন (মৃ. ১৯০৯), সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ ছিলেন হুগলি কলেজের গ্রাজুয়েট (আহমদ আলী মুন্সী, ১৩৮)। এভাবে তাঁর অর্থে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকেও তাঁর তহবিল থেকে প্রাপ্ত বৃত্তিতে বাংলাদেশে অগ্রসর শিক্ষিত বহু লোকের সৃষ্টি হয়েছে। নজরুল যেন এ বিষয়টি মেধা দিয়ে উপলব্ধি করেছেন,

ব্যর্থ হয়নি তব দান জানি, তোমার প্রেমের ঢেউ,
এনেছে শক্তি বন্যা বংগে হয়তো জানে না কেউ।

মাওলানা মোহাম্মদ আলী

মাওলানা মোহাম্মদ আলী (১৮৮৮-১৯৩১) ছিলেন সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বাগ্মী ও রাজনীতিবিদ। বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে তিনি তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতিতে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর বড় ভাই মাওলানা শওকত আলীও (১৮৭৩--১৯৩৮) যুগপৎ একই ভূমিকা পালন করেন। ইতিহাসে তাঁরা তাই 'আলী ভ্রাতৃদ্বয়' নামে পরিতি।

মোহাম্মদ আলী এলাহাবাদ কলেজ থেকে বি. এ, ও পরে অক্সফোর্ডের লিংকন স্কুল থেকে অনার্স ডিগ্রি লাভ করেন। কলেজে অধ্যয়ন কালেই তাঁর মানসিক বিকাশ ঘটে (Moinuul Haq, 1974 5)। বিলেত হতে দেশে ফিরে তিনি কিছুদিন রামপুরে শিক্ষা বিভাগে বরোদায় আফিম বিভাগে চাকুরি করেন। (Ibid, 5-6)। এ সময়কার তিক্ত অভিজ্ঞতায় তিনি সাধারণ মানুষের দাবি দাওয়া তুলে ধরার জন্য ১৯১১ সালে 'কমরেড' নামে একটি সাপ্তাহিক ও ১৯৯৩ সালে 'হামদর্দ' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।[১১] এগুলোতে বিশেষ করে কমরেড ব্রিটিশ-শাসন-

১১. 'হামদর্দ'-এর উদ্দেশ্য ছিল জনশিক্ষা দেওয়া, কিন্তু 'কমরেড'-এর লক্ষ্য তাদের মুখপত্র হওয়া এবং শাসক ও শাসিতের মধ্যে মধ্যস্থরূপে কাজ করা।' (আবুল হাসান সামসুদ্দীন, ১৯৬৮ : ৬৪)

বিরোধী কলাম লেখার অভিযোগে তাঁর ভাইসহ তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং পত্রিকা দুটির প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়া হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে, ১৯১৯ সালে, ২৫ ডিসেম্বর, তাঁদের মুক্তি দেয়া হয় (চৌধুরী শামসুর রহমান, ১৯৭০ : ৪৮)। এ সময় তুরস্কের ওপর প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ ও তার মিত্ররা তুরস্ককে খণ্ড বিখণ্ড করে ভাগ বাঁটোয়ারা করে নেবার উদ্যোগ গ্রহণ করে। আলী ভ্রাতৃদ্বয়সহ ভারতীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দ এর বিরুদ্ধে খিলাফত আন্দোলন গড়ে তোলেন (১৯১৯)। ১৯২০ সালে (মার্চ) আলীর নেতৃত্বে একটি খিলাফত প্রতিনিধি দল লণ্ডনে যায়। তাঁরা ব্রিটিশ সরকারকে তাঁদের মনোভাব বুঝাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি (Moinul Haq, 116)। অক্টোবর মাসে তাঁরা দেশে ফিরে আসেন এবং গান্ধীর সঙ্গে আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। করাচিতে এক খিলাফত সম্মেলনে (৮ জুলাই ১৯২১) ব্রিটিশ-বিরোধী উত্তেজনাকর বক্তৃতা করার অপরাধে আলী ভ্রাতৃদ্বয়কে পুনরায় গ্রেফতার করা হয় (১৪ সেপ্টেম্বর) ও প্রহসনমূলক বিচারে কারাদণ্ডাদেশ দেয়া হয়। মুক্তি লাভের (আগস্ট, ১৯২৩) পর তিনি কোকনদ কংগ্রেসের সম্মেলনে (ডিসেম্বর ১৯২৩) সভাপতি নির্বাচিত হন। এ সভায় তিনি তাঁর দীর্ঘ ভাষণে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৯২৪ সালে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা চরম আকার ধারণ করে, বিশেষ করে, কোহাটে সংঘটিত দাঙ্গা (সেপ্টেম্বর, ১৯২৪) হিন্দু-মুসলমান নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিভঙ্গিকেও পাল্টে দেয়। পরবর্তীকালে নেহেরু রিপোর্টকে কেন্দ্র করে মোহাম্মদ আলী কংগ্রেসের সংগে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

সাইমন কমিশনের (১৯২৮) সুপারিশের ভিত্তিতে আহূত ১৯৩০ সালে লণ্ডন গোল টেবিল বৈঠকে কংগ্রেস যোগ না দিলেও মাওলানা মোহাম্মদ আলীসহ অন্য মুসলিম নেতৃবৃন্দ যোগ দেন। ঐ বৈঠকে মাওলানা মোহাম্মদ আলী ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নে জোর কণ্ঠে বক্তব্য পেশ করেন (১৯ নভেম্বর ১৯৩০)।

কিন্তু বৈঠক শেষ হবার পূর্বেই তিনি বার্ধক্য জনিত কারণে সেখানে মৃত্যুবরণ করেন (৪ জানুয়ারি ১৯৩১) বায়তুল মোকাদ্দাসের মুফতি-এ-আজমের বিশেষ তারবার্তার অনুরোধে [এমন কি তার নিজের ইচ্ছাও নাকি ছিলো] তাঁকে জেরুজালেম শহরের খলিফা ওমর মসজিদের পাশে সমাহিত করা হয় (চৌধুরী শামসুর রহমান, ৭৮)। তাঁর এ মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে আসে। নজরুল এ উপলক্ষে লেখেন তাঁর অন্যতম নাম-কবিতা 'মাওলানা মোহাম্মদ আলী'। কবিতাটি ঐ সময় 'সওগাত' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় (রফিকুল ইসলাম, ১৯৬০ : ৪০৬)।

নজরুল মাওলানা মোহাম্মদ আলীকে ভারতের 'চন্দ্র-সূর্য' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর অসাধারণত্ব, ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, এমন নেতা তৎকালীন আরব, ইরান, তুরান, ইরাক, মিসর বা সিরিয়ায় ছিলেন না। ঐ সব দেশের করিম, সউদ, কামাল বা জগলুলের চেয়েও শ্রেষ্ঠ ছিলেন তিনি। বরং তিনি একাই ছিলেন তাঁদের সবার সমান,

উহাদের ছিল ইবনে করিম, সউদ, কামাল, জগলুল,
আমাদের ছিল মোহাম্মদ আলী একাই সবার সমতুল।

ঐসব নেতার মতো তাঁর লোক-লস্কর-বিত্ত-বৈভব ছিলে না, কিন্তু নেতৃত্বের গুণে তিনি সমৃদ্ধ ছিলেন। তাঁর ছিলো উদার হৃদয়, বুদ্ধিমত্তা ও প্রখর লেখনী শক্তি। তা দিয়েই তিনি শত্রুর মোকাবেলা করেছেন। কামান, গোলা ও তরবারি তাঁর পায়ে অবনত হয়েছে ; এমনি ছিলো তাঁর চারিত্রিক মাহাত্ম্য,

ছিল নাকো তেগ্ হাতিয়ার তার, আছিল লেখনী আর দিল,
অভয় বাণীর ভরসা লইয়া তাড়ায়েছে তবু আজাজিল।
সে ছিল ফকির মুসাফির শুধু, ভিক্ষার ঝুলি ছিল যার,
তবু তারি পায়ে করেছে সালাম কামান গুলি ও তরবার।

মাওলানা মোহাম্মদ আলী ছিলেন যুগপৎ ধর্মনিষ্ঠ ও ধর্ম-নিরপেক্ষ। ব্যক্তিজীবনে ধর্মপ্রাণ হয়েও তিনি রাষ্ট্রজীবনে হিন্দু-মুসলমান মিলনের বাণী প্রচার করেছেন। তাঁর এ ধর্মশিক্ষা ও ধর্মনিরপেক্ষতা যথার্থ উপমায় চিহ্নিত করেছেন কবি, 'ছিল অওরংগজেবী দ্বীনি জোশ্ আকবরী দিল মিনারের', "হিন্দু কাঁদিছে, 'গুরু' গেল বলি, মুসলিম কাঁদে, গেল পীর।" এবং এ কারণে তাঁর মৃত্যুতে হিন্দু-মুসলমান কাঁদছে সমান শোকে,

দেশ ও দশের মানুষের মুক্তিই ছিলো তাঁর স্বপ্নাকাঙ্ক্ষা। সেই আকাঙ্ক্ষার বাণী প্রচার করেছেন তিনি তাঁর পত্রিকায়। তাই তাঁর পত্রিকাগুলো বিশেষ কোনো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের ছিল না। সেগুলো ছিলো সাধারণ মানুষের মুখপত্র, "ছিল কমরেড, ছিল হামদর্দ, দীন দরিদ্র সকলের।"

কবি তাঁর বহুমুখী পরিচয় সূত্রে বলেছেন ঃ তিনি ছিলেন ভারতের মানুষের নয়নমণি, হৃদয়-শাহানশাহ ; তিনি ছিলেন তাদের আশা-ভরসার স্থল, নিশান-সর্দার,

দ্বীনি সর্দার, তিনি ছিলেন তাদের যুবরাজ, যৌবন শক্তির প্রতিমূর্তি। তিনি ছিলেন তাদের নেতা, দরবেশ। তাঁর মৃত্যুতে ভারতে বীরত্ব শূন্যতা, নেতৃত্ব শূন্যতা ও যেবৌন শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর পতাকা বহন করার মতো সাহসী পুরুষ ভূ-ভারতে আর নেই,

এ পতাকা বয়ে চলিবে কে আর, ভারতে তেমন নাই বীর,

দেশের স্বাধীনতা সন্ধি চুক্তিতে স্বাক্ষর করার জন্যে তিনি বৃদ্ধ বয়সে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গেছেন সুদূর লণ্ডনে। সেখানে তিনি নাকি বলেছিলেন, তিনি আর পরাধীন ভারতে ফিরে যাবেন না, মৃত্যু হলে তাঁকে যেন জেরুজালেমে সমাহিত করা হয়। কবিতার শেষাংশে কবি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করে মাওলানা মোহাম্দ আলীর স্বাধীনচেতা মনোভাবের পরিচয় তুলে ধরেছেন,

পরাধীন সোনার ভারত, হেথায় তাহারে আনিস্‌নে,
চির স্বাধীনতা, পথের পথিকে যেতে দে, হেথায় টানিস্ নে।...
সে দেশের পথ ভুলে এসেছিল, যেতে দেরে সেই জেরুজালেমে,
সে দেশে নাইরে বন্ধন, নাই পিঞ্জর কারা, নাই জালেম।

লক্ষণীয়, কবি কৌশলে শেষ পঙক্তিতে ভারতের পরাধীনতাকে 'বন্ধন', ব্রিটিশ শাসকদের নির্যাতনকে 'পিঞ্জর কারা' ও ব্রিটিশ শাসকদের 'জালেম' বলে অভিহিত করেছেন।

মাওলানা মোহাম্মদ আলীর দেশপ্রেম, হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ও দেশের স্বাধীনতার জন্যে আপোশহীন লড়াইয়ের কারণে নজরুল শ্রদ্ধাবনতচিত্তে তাঁকে স্মরণ করেছেন।

নবীনচন্দ্র

নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯) উনিশ শতকের বাংলা কাব্য-সাহিত্যের কীর্তিমান কবিদের অন্যতম। তিনি গীতিকাব্য, কাহিনীকাব্য ও মহাকাব্য-এ তিন ধারায়ই অবদান রেখেছেন। সনাতন ধর্মবোধ ও দেশপ্রেম তাঁর কাব্য প্রেরণার উৎসমূল। তাঁর কাব্যকীর্তি হচ্ছে – 'অবকাশ রঞ্জিনী' (১ম ভাগ ১৮৭১, ২য় ভাগ ১৮৭৮), 'পলাশীর যুদ্ধ' (১৮৭৫), 'ক্লিওপেট্রা' (১৮৭৭) 'রঙ্গমতী' (১৮৮০), 'ত্রয়ীকাব্য (রৈবতক ১৮৮৭,

কুরুক্ষেত্র ১৮৯৩, প্রভাস ১৮৯৬), 'খ্রীস্ট' (১৮৯১) ও 'অমিতাভ' (১৯০১)। এছাড়া তিনি 'মার্কেণ্ডয়চণ্ডী' (১৯৮৯) ও শ্রীমদ্ভগবদগীতা'র (১৮৮৯) অনুবাদ করেন এবং 'ভানুমতি' (১৯০০) নামে গদ্য-পদ্যময় একটি আখ্যায়িকাও রচনা করেন। 'আমার জীবন' (১৩১৪, ১৩১৬, ১৩১৭, ১৩১৮, ১৩২০) নামে পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত একটি বিরাট আত্মীজীবনীও তিনি লিখে গেছেন। তাঁর জন্ম চট্টগ্রামে নয়াপাড়া গ্রামে। শিক্ষা ও কর্মসূত্রে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান শেষে চট্টগ্রামে অবসরযাপন করেছিলেন এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। কাজী নজরুল ইসলাম ১৯২৬ সালে (জুন) চট্টগ্রাম সফরে এসে আজিজ মঞ্জিলে অবস্থানকালে তাঁকে স্মরণ করে পরম শ্রদ্ধায় রচনা করেন 'নবীনচন্দ্র' শীর্ষক কবিতাটি। এটি ১৯৩০ সালে 'দরদী' (১৯৩০) পত্রিকার প্রথম বর্ষ পঞ্চম সংখ্যায় (আগস্ট-সেপ্টেম্বর) প্রথম প্রকাশিত হয় (রফিকুল ইসলাম, ১৯৬৯ : ৬৬)।

নজরুল প্রথমেই নবীনচন্দ্রকে 'বীর কবি' বলে সম্বোধন করেছেন এবং মিনতি প্রকাশ করেছেন তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ্য গ্রহণের জন্যে। এ শ্রদ্ধার্ঘ্য শুধু তাঁর একার নয়, ভারতচন্দ্র, চণ্ডীদাস, জয়দেব, কাশীরাম, কৃত্তিবাস ও কবিকঙ্কণের শ্রদ্ধার্ঘ্যও তিনি বহন করে এনেছেন। তিনি তাঁকে (নবীনচন্দ্রকে) 'অধিক আত্মীয়' ও 'পরম আত্মীয় বন্ধু' বলে ঘোষণা করেছেন।

নবীনচন্দ্রের ত্রয়ী কাব্য – বৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসকে আয়তনের বিশালতার জন্যে 'উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত' বলা হয়ে থাকে। কাব্য-সমালোচকরা একে শুধু 'উচ্ছ্বাস' বলে তাচ্ছিল্য করলেও নজরুল এ জাতীয় বিরূপ সমালোচনা প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বরং এর জন্যে তাঁকে 'উনবিংশ শতাব্দীর নবীন ব্যাস' বলে আখ্যাত করে বলেছেন ত্রয়ীকাব্য উচ্ছ্বাস নয় – পরাধীন ভারতের মর্মবেদনার বাণী,

উনবিংশ সতাব্দীর হে নবীন ব্যাস !
'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র', তোমার 'প্রভাস'
নব ভারতের বাণী-উচ্ছ্বাস নহে--
পরাধীন ভারতের ক্ষত মর্ম দহে
যে ব্যথা ভীষণ দাহে জ্বলে ধিকি ধিকি
হৃদি রক্তে তুমি ঋষি গেলে তাহা লিখি।

নজরুলের অভিমত হলো, পরাধীন ভারতবাসীকে জাগ্রত করার জন্যে, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে তিনি ত্রয়ীকাব্য রচনা করেছেন। এবং তাঁর সেই উদ্দেশ্য সফলও হয়েছে,

সিন্ধুরে ধরিয়া বুকে তুমি উতরোল,
জাগালে মৃতের দেশ নবীন কল্লোল।

নবীনচন্দ্র নিজের জাগ্রত চেতনা ও দেশাত্মবোধ এ কাব্যের মাধ্যমে অন্যের মনে সঞ্চারিত করতে পেরেছেন।

তোমার প্রাণের ঐ প্লাবন উচ্ছ্বাসে
যে পড়ে সে ভেসে যায়, আর নাহি আসে
ফিরে তার কূলে, কবি।

নবীনচন্দ্রের কাব্যপাঠে যে চেতনার জোয়ার জাগে কবি তার স্বরূপ নির্দেশ করেছেন এভাবে,

তোমার জোয়ার
এতই ভীষণ ওগো এতই দুর্বার,
দেখিতে ডুবিতে যাই, তত বন্যা ঢল
কেবলি ভাসায়ে নেয় নিরুদ্দেশ পানে,
তল আছে – কূল নাই তোমার তুফানে।

খুব কম সংখ্যক কবিই কবিতার মাধ্যমে বিশ্বে সাধারণ মানুষকে জাগাতে পেরেছেন। নবীনচন্দ্র সেই কম সংখ্যক কবিদেরই একজন। নজরুল অবশ্য এ ক্ষেত্রে তাঁকে তুলনাবিরল বলে বর্ণনা করেছেন.

হে কবি ধরায় নাহি তার সমতুল,
যার স্রোতে ভেংগে যায় হৃদয়ের কূল।

এ জাগর চেতনা সৃষ্টিতেই নবীনচন্দ্রের সার্থকতা।

স্বধর্মের প্রতি নবীনচন্দ্রের নিষ্ঠা থাকলেও অন্য ধর্ম বা সম্প্রদায়ের প্রতি তিনি বিদ্বিষ্ট ছিলেন না ; বরং, অন্য ধর্মের মহৎ পুরুষের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিলো সমান।

সে কারণে তিনি খ্রিস্ট [illegible] ও বুদ্ধ চরিত্র নিয়ে [illegible] কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। [illegible] ঔদার্যের পরিচয় মেলে। [illegible] নবীনচন্দ্রের জন্মভূমি চট্টগ্রাম [illegible] এ দিকটি উপলব্ধি করেছেন এবং তা শৈল্পিক সৌকর্যে তুলে [illegible]

হে সরল। [illegible]
মৃন্ময় [illegible]
সকলে [illegible]—
রচিয়াছ [illegible]
উঠেছিল [illegible],
প্রিয় [illegible] ঘরে।

নবীনচন্দ্রের মৃত্যুর পর [illegible] শোকসভার রিপোর্টে 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকা লেখে (২৩ ফাল্গুন [illegible]) [illegible] কবি নবীনচন্দ্র সেনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশার্থে [illegible] উদ্যোগে গত রবিবার স্থানীয় জগন্নাথ কলেজের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে এক [illegible] অধিবেশন হইয়াছিল। (মুহম্মদ আবদুল কাইউম, ১৯৯০ , ৮৭)। এ [illegible] তৎকালীন সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি ও নজরুলের ভাষ্যের যথার্থতা উপলব্ধি [illegible]।

নবীনচন্দ্র সেন সম্পর্কে সাহিত্য-[illegible], গোঁড়া মুসলমানদের ও গোঁড়া হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যায়ন [illegible] কোন সাহিত্য-সমালোচক তাঁকে 'অসংযত' বলে তাচ্ছিল্য করেছেন, [illegible] তাঁকে 'হিন্দু জাতীয়তাবাদী' বলে অবজ্ঞা করেছেন এবং [illegible] রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দ্রষ্টা' বলে গ্রহণ করেছেন। নজরুল [illegible] উদার ও সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে [illegible] কবিতায় নবীনচন্দ্র [illegible] চিত্রিত [illegible]

উপসংহার

উপর্যুক্ত নাম-কবিতাসমূহে কাজী [illegible] জীবন ও [illegible] বর্ণনা ও প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে [illegible] স্বদেশের মানুষকে [illegible]

পশ্চাৎপদ বাঙালি মুসলমানদেরকে ঐ সব মহৎ ও সংগ্রামী পুরুষেরা আদর্শে ও চেতনায় উজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছেন। তাই এসব নাম-কবিতা শুধু স্তব, স্তুতি, স্তেস্ত্রে বা প্রশস্তিতে কিংবা নীরস জীবন আলেখ্যে পর্যবসিত হয়নি। তিনি চেয়েছেন ব্যাপক জনজাগরণ ও সংস্কারমুক্তি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভাষা, ছন্দ বা উপমা শৈথিল্য ঘটলেও উদ্দীপনা ও জনজাগরণ সৃষ্টির দিক থেকে এগুলো ভিন্ন তাৎপর্যে মণ্ডিত। এসব কবিতায় নজরুলের ইতিহাস সচেতনতা, উদার নৈতিকতা, প্রগতিশীলতা ও বিপ্লবী মানসিকতা স্পষ্টাক্ষরে মুদ্রিত হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি

অঞ্জলি বসু, (সম্পাদিত) ১৯৭৬ : *সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান*, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা

অসীতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৭৮ : *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, ৩য় খণ্ড*, মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলকাতা

আবদুর রহমান, খান বাহাদুর আলহাজ্জ ১৯৬৪ : *আমার জীবন*, ঢাকা

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, (সম্পাদিত) ১৯৯০ : *সাময়িকপত্রে সাহিত্যিক প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

আব্দুল কাদির (সম্পাদিত) ১৯১৩ : *নজরুল রচনাবলী ১ম -৪র্থ খণ্ড*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

আবুল হাসান শামসুদ্দীন (অনূদিত) ১৯৬৮ : *আত্মজীবনী : মাওলানা মোহাম্মদ আলী*, বাংলা একাডের্মে, ঢাকা

আহদম আলী মুন্সী ১৯৬৯ : *দানবীর হাজী মোহাম্মদ মোহসীন*, কোরান মঞ্জিল, বরিশাল

এস. এম. হাসান ১৯৮৯ : *ইসলাম ও আধুনিকতা*, গ্লোব লাইব্রেরী, ঢাকা

কাজী নজরুল ইসলাম (সম্পাদিত) ১৯২২ : *ধূমকেতু* (৬ষ্ঠ–২১ সংখ্যা), কলকাতা

(পরিচালিত) ১৯২৫ : লাঙল (১ম–১৫ সংখ্যা), কলকাতা

গোপালচন্দ্র রায় (সম্পাদিত) ১৯৬৬ : *শরৎচন্দ্র*, সাহিত্য সদন, কলকাতা

গোপিকানাথ রায় চোধুরী ১৯৮৬ : *দুই বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তী বাংলা কথা সাহিত্য*, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা

চোধুরী শামসুর রহমান ১৯৭০ : *মোহাম্মদ আলী*, সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ, ঢাকা

জমির আহমদ ১৯৯০ : *ফেনীর ইতিহাস*, সমতট প্রকাশনী, চট্টগ্রাম

মাহমুদ নূরুল হুদা ১৯৮৮ : *চিরঞ্জীব নজরুল,* সুবর্ণ, ঢাকা

মুসা আনসারী ১৯৮৮ : *আধুনিক মিশরের ঐতিহাসিক বিকাশ ধারা,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মোবাশ্বের আলী ১৯৯৫ : *সাময়িকপত্র ও নজরুল,* নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা

মোস্তফা নুরউল ইসলাম ৯১৮৭ : *সমকালে নজরুল ইসলাম,* বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা

রফিকুল ইসলাম ১৯৬৯ : *নজরুল নির্দেশিকা,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা

১৯৯১ : *কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও সাহিত্য,* কে, পি বাগচী এণ্ড কোং, কলকাতা

শেখ দরবার আলম ১৯১৮ : *অজানা নজরুল,* ৪র্থ সং মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা

সজনীকান্ত দাস (সম্পাদিত) ১৩৬৬ : *নবীনচন্দ্র রচনাবলী,* ১ম খণ্ড বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা

শ্রী সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, : ১৩৩৯ : *মহারাজ মনীন্দ্র চন্দ্র,* গুরুদাস এণ্ড সন্স প্রা. লি. কলকাতা

সুধীর কুমার মৈত্র ১৯৯২ : *পত্র-পত্রিকার আলোকে নজরুল,* ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা,

শ্রী অধীর চন্দ্র সরকার, (সংকলিত) ১৩৭৩ : *জীবনী অভিধান,* এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স প্রা. লি. কলকাতা

Bernard Lewis 1968 : *The Emergence of Modern Turkey*, 2nd ed. Oxford University Press, London

Leon B. Poullada 1973 : *Reform and Rebellion in Afghanistan* : 1919-1929, Cornell University Press, London

Mahmud Y. Zayid 1965 : *Egypt's Struggle for Independence*, Krayats. Beirut

Moinul Haq, S. 1978 : *Mohamed Ali*, Pakistan Historical Society. Karachi